ভ্রমণে সৃজনে বিজনে অন্তরঙ্গ অমরেন্দ্র

কামরুল হাসান

কখনও কোনও ব্যক্তি হয়ে দাঁড়ান প্রতিষ্ঠান। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী এমনি একজন ব্যক্তি যিনি এখন একটি প্রতিষ্ঠান। কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ, এমনকি বাংলাদেশেও, বস্তুত সারা পৃথিবীতে যেখানে বাঙালি আছে সেখানে ভ্রমণ বিষয়ে তিনি শুধু একটি নাম নন, একটি প্রতিষ্ঠান। তাঁর 'ভ্রমণ' পত্রিকার প্রতি সংখ্যার গড় পাঠক ৬ লক্ষ ৭০ হাজার। ভাবা যায়? তিনি একাধারে কবি, শিশুসাহিত্যিক, ভ্রমণ লেখক, ভ্রমণ বিষয়ক চলচ্চিত্র নির্মাতা, কথাসাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী ও সম্পাদক। আশি ছুঁই ছুঁই মানুষটি নিরন্তর সৃষ্টিশীল। লেখালেখি ও ভ্রমণ তাঁর প্রধান দুই নেশা। তিনি শিশুসাহিত্যে ভারতের সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক, রাজ্যের বিদ্যাসাগর পুরস্কার-সহ আরও বহু সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন। প্রকাশিত ৩২টি বইয়ের অর্ধেকই শিশুসাহিত্য। বহুমুখী প্রতিভার মানুষটির প্রধান দুটি পরিচয়– তিনি শিশুকিশোরদের জন্য লেখেন এবং ভ্রমণ পত্রিকার প্রধান সম্পাদক। নিজের লেখা ছাড়াও তিনি ভ্রমণবিষয়ক ১০টি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। আমার ধারণা তাঁকে সবচেয়ে বেশি চেনে শিশুকিশোররা এবং ভ্রমণসাহিত্য পিপাসু পাঠকগণ। এককথায় তিনি একজন কীর্তিমান পুরুষ, একজন সেলিব্রিটি। কিন্তু নিজের ফেসবুক প্রোফাইলে লিখেছেন, আসলে (আমি) তেমন কেউ না। এ থেকে বোঝা যায় তার বিনয়ের দিকটি।

সম্প্রতি তিনি বাংলাদেশে এসেছিলেন। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সেই অনুষ্ঠানে আমি যেতে পারিনি, সেখানে গিয়েছিলেন 'ভ্রমণগদ্য' পত্রিকার সম্পাদক কবি ও ভ্রামণিক মাহমুদ হাফিজ। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী নামক মহীরুহের সঙ্গে তখন থেকেই মাহমুদ হাফিজের পরিচয়। ভ্রমণগদ্যের জন্য একটি লেখার প্রতিশ্রুতি তিনি ঠিকই আদায় করে নেন আর মনস্থ করেন কলকাতা গিয়ে তাঁর সাক্ষাৎকার নেবেন। সে সুযোগ মিলল, যখন তিনি হলদিয়া সাহিত্য উৎসবে যোগ দিতে পশ্চিমবঙ্গে গেলেন। হলদিয়ায় তাঁর প্রধান সঙ্গী ছিলাম আমি, চাইলেন আমিও যোগ দেই। কলকাতা থেকে যোগ দিলেন কবি অনন্যা পাল। আমরা তিনজন দুটি ভিন্ন গাড়িতে গিয়ে পৌঁছই অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর দক্ষিণ কলকাতার বাড়িতে। তিনি সময় দিয়েছিলেন ২১ তারিখ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটা থেকে বারোটা--- এই দেড় ঘণ্টা। অসম্ভব ব্যস্ত মানুষটি ঘড়ি ধরে চলেন, তা থেকে দেড় ঘণ্টা সময় পাওয়া সৌভাগ্যের বলতে হবে।

বাংলাদেশ থেকে এসেছি বলেই হয়তো রাজি হয়েছেন। অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে মাহমুদ হাফিজ যোগাযোগ করেছিলেন (তাঁরই পরামর্শে) অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর সেক্রেটারির সঙ্গে, এমনকি বাড়ির ঠিকানাও নিতে হয়েছিল সেক্রেটারির কাছ থেকে। এসব ব্যাপারে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী বেশ আনুষ্ঠানিক, তিনি hierarchy মেনে চলেন। কয়েকটি ধাপ পেরিয়ে তবেই তাঁর কাছে পৌঁছনো যায়।

ঢাকুরিয়া ফ্লাইওভার পার হয়ে গাড়ি ঢুকল সেলিমপুর রোডে। আমাদের উবার পৌঁছেছে সকাল দশটায়, অনন্যা পাল তার গাড়িতে চড়ে এলেন দশটা দশে। মাহমুদ হাফিজের ইচ্ছা তক্ষুণি সূর্যদীপে ঢুকে পড়া। সূর্যদীপ হল অমরেন্দ্র চক্রবর্তী যে অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন সে কমপ্লেক্সটির নাম। সংলগ্ন এক পার্কের সন্নিকটে দাঁড়িয়ে আমরা কথা বলি, পরে বাকি সময়টুকু কাটাতে আমরা সেলিমপুর সড়কের এক পথিপার্শ্ব চা-দোকানে যাই আর হুইস্কি কাপের মতো ক্ষুদ্র কাগজের কাপে চা-পান করি। দেখি অনতিদূরেই রেললাইন চলে গেছে।

ঘড়ির কাঁটা সাড়ে দশের ঘরে যাওয়ার একটু আগে আমরা সূর্যদীপে প্রবেশ করি। প্রাচীন যুগের এক লিফট, সেখানে চড়তে একটু দ্বিধান্বিত মাহমুদ হাফিজ, বিশেষ করে নিরাপত্তা কতখানি তা নিয়ে তার সংশয় কাটে না। আমি অভয় দেই, অনন্যা পাল কোলাপসিবল গেট টেনে খোলেন। প্রাচীনকালের লিফট হলে কী হবে, বিদ্যুৎগতিতে সর্বশেষ তলায় নিয়ে যায়। দরজা খুলে দেন এক নারী, তার অবয়ব দেখে বুঝি পরিচারিকা গোছের কেউ হবেন। বৃহৎ বৈঠকখানায় ঢুকে মুগ্ধ হবার পালা। কেননা, পুরো ঘর, তার ছয়টি দেয়াল জুড়ে অসংখ্য পেইন্টিং। একটি ঘরের ছয়টি দেয়াল হয় কী করে? এটা হয়েছে বড় বসবার ঘরটির সঙ্গে একটি লাগোয়া ছোট ঘর বানানোয় বড় ঘরের সঙ্গে যার একটি কমন দেওয়াল, আর অষ্টম দেওয়ালটি নেই। প্রথমে মনে হয়েছিল তাঁর ছবির সংগ্রহটি অসাধারণ, কিন্তু আঁকার ধরণ দেখে আমি ও অনন্যা পাল স্বতন্ত্রভাবে একই উপলব্ধিতে পৌঁছই যে--- এইসব চিত্রকলা একই শিল্পীর আঁকা, যার নাম অমরেন্দ্র চক্রবর্তী। পরে জেনেছি আমাদের ধারণা সঠিক।

আমরা গিয়ে বসেছি পেতে রাখা সোফায় আর ঘাড় ঘুরিয়ে চিত্রকলা দেখছি, দেওয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখা আলমারিগুলো বই আর পত্রপত্রিকায় ঠাসা, কিন্তু আমরা সেসব দেখিনি। আমরা দেখেছি তৈলচিত্র। শ্রীঅমরেন্দ্র চক্রবর্তী ওপাশের ভেজানো কপাট ঠেলে প্রবেশ করলেন, তার ভঙ্গি ছিল রাজসিক। এই পরিবেশ যে অত্যন্ত অভিজাত এবং তিনি যে সহজেই নাট্যমঞ্চে পুরনো জমিদারের ভূমিকায় উৎপল দত্তের মতোই অবতীর্ণ হতে পারতেন, তা নিয়ে প্রতীতি জন্মে, সংশয় নয়। আমরা উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান জানাই। তিনি বসেন ওপাশের দুটি একক সোফার একটিতে, মাহমুদ হাফিজের পাশে। অনন্যা পাল, আমার পুত্র প্রান্ত ও আমি বসেছি মুখোমুখি তিন সোফায়। মাহমুদ হাফিজ ভ্রমণগদ্যের সর্বশেষ সংখ্যাটি তাঁকে উপহার দেন। আমি নিয়ে গিয়েছিলাম আমার অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণকাহিনি 'মহাদেশের মতো এক দেশে'। বইটির পুরুত্ব খেয়াল করে তিনি বললেন, 'পড়ব, তবে দেরি হবে। অনেক বই জমে আছে।' আলোচনার সুবিধার্থে আমরা সোফা ছেড়ে ঘরটির ভেতরে যে একটি তিন দেওয়ালের ছোট, ঘর না বলে স্পেস বলাই সঙ্গত, আছে সেখানকার

টেবিল ঘিরে রাখা চেয়ারে এসে বসি। এখানেই তিনি লেখালেখি করেন। অফিসের কাজও করেন। শুরু করার আগে মাহমুদ হাফিজ সাক্ষাৎকার গ্রহণের পটভূমি বললেন। আগের সংখ্যায় বাংলা সাহিত্যের এক কিংবদন্তি কথাসাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহের সাক্ষাৎকার নেওয়ার উল্লেখ করলে তার সপ্রতিভ উত্তর, 'আপনারা লিজেন্ড খুঁজছেন। তাহলে আমি কেন?' তিনি নিজেও যে লিজেন্ড তা তো তিনিও জানেন, ওই বিস্ময় হল তার বিনয়ের সুললিত প্রকাশ।

মাহমুদ হাফিজের প্রথম প্রশ্ন জীবনের বাঁকে বাঁকে বিপজ্জনক ফাঁদ লুকিয়ে থাকে। আপনার জীবন তো অ্যাডভেঞ্চারে পরিপূর্ণ। আমাদেরকে কি এরূপ কিছু অভিজ্ঞতা বলবেন?

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী বললেন, মানুষের জীবনে বাঁচাই যখন অনিশ্চিত, তখন বেঁচে থাকাটাই তো গল্প। আন্টার্কটিকার একটি ঘটনা তিনি বললেন। বরফের উপর হাঁটু গেড়ে বসে পেঙ্গুইনের ছবি তুলছেন, হঠাৎ টের পেলেন নরম তুষারে তিনি ক্রমশ নীচে তলিয়ে যাচ্ছেন। উঠবার জন্য এক পা তুললে অন্য পা ডেবে যাচ্ছে। এখন যে ভর দিয়ে দাঁড়াবেন, নীচে তো শক্ত কিছু নেই। সমুদ্রের বুকে নোঙর ফেলা যে-জাহাজ থেকে বরফের ডোঙায় চড়ে তারা সেখানে গেছেন, সেই ডোঙার লোকেরা সবাই জাহাজে ফিরে গেছেন। তিনি যে ফিরে যাননি, এটা কেউ খেয়াল করেনি। তিনি স্পষ্ট শুনতে পেলেন একজন বলছেন, মিস্টার চক্রবর্তী কি ফিরেছেন? তিনি বরফের মধ্যে ধীরে ডুবে যাচ্ছেন, অথচ কারও নজরে পড়ছেন না। সেখানে নিয়ম ছিল সকলকে উজ্জ্বল রঙের পোষাক পরতে হবে, বরফের ধবধবে শুভ্রতার ভেতর উজ্জ্বল রং পরিধান করলে দূর থেকে দেখা যায়। তাই ওই নিয়ম। সে যাত্রায় তাঁর মনে হয়েছিল আর উঠে আসতে পারবেন না।

মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত নিকট থেকে তিনি পেঙ্গুইনের যেসব ছবি তুলেছিলেন সেগুলো অপূর্ব উঠেছিল। অথচ ক্যামেরা বলতে খুব সাধারণ সিঙ্গল সিসিডি হ্যান্ডিক্যাম। তাঁর বন্ধু, কবি ও চলচ্চিত্র পরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত নাকি বলেছিলেন, 'তুমি যে ক্যামেরা নিয়ে আন্টার্কটিকায় যাচ্ছ, সেটা আসলে একটা টয় ক্যামেরা।' তাঁর আরেক চলচ্চিত্র পরিচালক বন্ধু গৌতম ঘোষ বলেছিলেন, 'এ ক্যামেরায় সাদা তুষারের ছবি কার্বন পেপারের মতো কালো হয়ে যাবে!' এসব শুনে তিনি তাঁর সেক্রেটারিকে জাপানের সোনি কোম্পানির সঙ্গে কথা বলতে বললেন। সেক্রেটারি তখনই ই-মেল পাঠিয়ে উত্তর পেলেন, 'এমনিতে ঠিক আছে কিন্তু আন্টার্কটিকার ঠান্ডায় লেন্স মে ক্র্যাক।'

একবার বিদেশযাত্রার কালে বিমানবন্দরে যাওয়ার আগের দিন তিনি এই ক্যামেরা কিনেছিলেন। দোকানি তাকে ক্যামেরাটি ব্যবহারের মৌলিক কিছু টিপস দিয়েছিলেন। প্লেনে বসে তিনি ম্যানুয়াল পড়ে বাকি ফাংশানগুলো শিখে নিয়েছিলেন। স্বীকার করলেন, তিনি ক্যামেরা সম্পর্কে অজ্ঞ। জটিল ক্যামেরা চালাতে পারেন না। তাছাড়া বড় ও ভারি ক্যামেরা বইতেও ভালোবাসেন না। দূরদর্শনে যখন তাঁর তোলা ভিডিও চিত্র, আন্টার্কটিকা দেখানো হচ্ছে তখন সেই ক্যামেরার দোকানের ম্যানেজার ফোনে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কোন ক্যামেরায় তোলা এ-ছবি? তারা বিশ্বাসই করে না যে

পুরো আন্টার্কটিকা তাদের ভিডিও হান্ডিক্যামে তোলা।

ইতিমধ্যে সামনে পেতে রাখা কাগজে একটি অসমাপ্ত লেখা সমাপ্ত করার চেষ্টা করছেন। এটি সেই লেখা যা তিনি কাল রাত দুটোয় লিখছিলেন, সমাপ্ত করতে পারেননি। কম্পিউটার আর মোবাইলের যুগে তিনি লিখতে কাগজ-কলম ব্যবহার করেন দেখে মাহমুদ হাফিজ কৌতূহলী হলেন। তিনি জানালেন, কাগজ কলমেই তার স্বস্তি। তিনি আধুনিক যুগের মানুষ, কিন্তু নতুন যুগের প্রযুক্তি ব্যবহারে স্বচ্ছন্দ নন। যেমন তার ছবি দেখে অনেকে তাকে গুণী আলোকচিত্রী ভাবেন, কিন্তু তিনি বলেন, 'আমি ক্যামেরা সত্যিই চিনি না।'

মাহমুদ হাফিজ বলেছিলেন, জীবনের বাঁকে বাঁকে অজস্র চমকপ্রদ ঘটনা লুকিয়ে থাকে। তিনি যেন আমাদের সেসব কিছু ঘটনা বলেন। এরপরে যে ঘটনাটির কথা বললেন সেটি ঘটেছিল আফ্রিকার তাঞ্জানিয়ায়। সেখানে সেৎসি নামে একপ্রকার মাছি আছে যা কামড়ালে মানুষ কেবলই ঘুমিয়ে পড়ে। সে ঘুম এক সময় আর ভাঙে না অর্থাৎ মৃত্যু ঘটে। আফ্রিকার কথা শুনে অনন্যা পাল জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কি সেই জায়গা যেখানে অনেক জলহস্তী ঘুরে বেড়ায় আর পাখিরা জলহস্তীদের পিঠে বসে থাকে?' তিনি বললেন, 'কোন জায়গা?' অনন্যা পাল বললেন, 'নাইভাসা লেক। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেলে বেশ দেখানো হয় জায়গাটি।' তিনি বললেন, 'না, এটা আরেকটি জায়গা।' সেখানেই তিনি জলহস্তীর হাঁ করা বিরাট মুখগহ্বরের ছবি তুলছিলেন। এমনি সময়ে টের পেলেন কানের পাতায় মোটা সূঁচ ঢোকালে যেমন ব্যথা হয়, তেমনি ব্যথা হচ্ছে। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে যাচ্ছেন, অথচ নড়তে পারছেন না। আসলে তিনি নড়ছেন না, জলহস্তীর হাঁ-করা অতিকায় মুখের ছবি না তুলে নড়বেন না। শটটা নেওয়া হয়ে গেলে হাতের থাবা মেরে পতঙ্গটিকে মাটিতে ফেলে দিলেন, মনে হল মাটির একটি ক্ষুদ্র দলা নীচে পড়ে গেল। মাছিটির শুড় ছিল সূঁচের মতো মোটা, যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে যাচ্ছিলেন। সঙ্গে থাকা আফ্রিকান গাইডকে জিজ্ঞেস করলেন,

'এটা কী? ভয়ঙ্কর কিছু? ক্ষতিকর?'

গাইড বলে, 'এটা সেৎসি মাছি।'

সেৎসি মাছি যে ভয়ঙ্কর তিনি তা জানতেন। 'এ মাছি কামড়ালে নাকি ঘুম পায়, জ্বর হয়?'

স্থানীয় গাইড একগাল হেসে বলে, 'হ্যাঁ। এ সেই একই মাছি।'

'সে ঘুম নাকি আর ভাঙে না?'

গাইডের হাসি আরও বিস্তৃত হল। সে ঘাড় কাত করে সম্মতিসূচক ভঙ্গি করে, অর্থাৎ ভাঙে না। তার হাসি দেখে মনে হল, মৃত্যু কোনও বিষয় নয়। তিনি আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। জিজ্ঞেস করলেন,

'আমি কি ডাক্তারের কাছে যাব?'

গাইড দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়াল, 'না, না। যাওয়ার দরকার নেই।'

তিনি অবাক! মৃত্যু হতে পারে, অথচ এ বলছে ডাক্তারের কাছে যাবার দরকার নেই। আফ্রিকান গাইড তখন তাঁকে আশ্বস্ত করে 'একবার কামড়ালে কিছু হয় না।

অনেকবার কামড়ালে তবে মৃত্যু ঘটে।'

দুটি ঘটনা শুনে মাহমুদ হাফিজের মন্তব্য, 'বিপদ তাহলে ছবি তোলার সময়েই বেশি ঘটে।'

আমাদের প্রাণে আনন্দ জুগিয়ে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী প্রস্তাব করলেন, 'একটু চা খাওয়া যাক?' পরিচারিকাকে ডেকে বললেন, 'দ্যাখো তো, আমরা চা খেতে পারি কি না?'

মাহমুদ হাফিজ পেশাদার সাংবাদিক। তিনি একের পর এক প্রশ্ন করছিলেন। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী বললেন, 'সমস্যা কী জানেন, সবাই আমার কাছ থেকে আমার বিষয়ে শুনতে চায়। কিন্তু নিজের কাজ নিয়ে কথা বলতে বিরক্ত লাগে। আমার ছবি আছে, লেখা আছে। সেসব দেখলে আর পড়লেই তো হয়। সাক্ষাৎকার নেবার আগেও সেসব পাঠ করা উচিত।' তাঁর এই কথাটি যুক্তিযুক্ত। একজন লেখককে জানতে হবে তাঁর লেখা পাঠ করে। একথা যখন লিখছি তখন মাহমুদ হাফিজের একথাও মানছি যে অন্তরঙ্গভাবে লেখককে জানতে হলে সাক্ষাৎকারের কোনও বিকল্প নেই, তার সঙ্গে কথা বলার, মেশার বিকল্প নেই। ইন্টারভিউর উদ্দেশ্য তো তাই।

নিজের লেখাটি সমাপ্ত করার জন্য তিনি একটু সময় চাইলেন আমাদের কাছে। ইতিমধ্যে পাপিয়া নামের গৃহকর্মী ট্রেতে সাজিয়ে পেস্ট্রি কেক ও ছোট বাটিতে দই নিয়ে এল প্রত্যেকের জন্য। সমস্যা হল আমরা কেউ পেস্ট্রি কেক খাই না। যে খায়, আমার ছেলে প্রান্ত বসে আছে দূরের সোফায়। তার চোখে রাজ্যের বিরক্তি। কেননা, তার কোনও কাজ নেই আর কলকাতা এসে কলকাতাই দেখা হচ্ছে না। বয়স্ক মানুষগুলো কী সব কথাবার্তায় মগ্ন। শ্রীমতী সর্বাণী চক্রবর্তী প্রান্তকে দেখে আফশোস করলেন, অমরেন্দ্র চক্রবর্তীও আফশোস করে বললেন, 'আহা, ও একা একা বসে আছে। ওকে পড়ার জন্য বই দেওয়া উচিত ছিল।' বই তো চারপাশেই ছড়ানো, কিন্তু নতুন প্রজন্মের আগ্রহ নেই বইয়ে, সাহিত্যের বইয়ে তো নয়ই। প্রান্ত মগ্ন ছিল মোবাইলে, নতুন প্রজন্মের প্রধান পুস্তক। ওকে মন ভালো করতে ছাদে নিয়ে গেলেন স্নেহশীলা সর্বাণী চক্রবর্তী, যার ডাক নাম টুকু।

শ্রী চক্রবর্তী সুইজারল্যান্ডের একটি অভিজ্ঞতা শেয়ার করলেন। সেখানে তার হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে এক লোক উধাও হয়ে গেল, অথচ ব্যাগের ভিতর পাসপোর্ট, ইউরো, মূল্যবান কাগজপত্র। তিনি পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন, একজন সুইস একাজ করতে পারে তার বিশ্বাস হয় না। পুলিশ অফিসার বলেছিল, সে সুইস নয়। বাইরে থেকে আগত কেউ। পরে চেহারার বর্ণনা শুনে প্রথমে বলেছিলেন পূর্ব ইউরোপের কেউ হবে, পরে বলেছিল সে একজন রাশিয়ান। লোকটা ছিঁচকে চোর। ধরা পড়েনি, ব্যাগও উদ্ধার হয়নি। শুধু রাস্তার ধারে ঝোপের মধ্যে থেকে পুলিশ পাসপোর্ট উদ্ধার করে দেয়।

সুইজারল্যান্ডের পার্বত্য গ্রাম জারমট। জুরিখ থেকে ট্রেনে যেতে হয়। জারমট থেকে আরেকটা ট্রেনে ইন্টারলাকেন। আমি বাদে বাকি তিনজনেরই যে ইন্টারলাকেন বেশ ভালো চেনা, তা তাদের আলোচনা থেকে তা সুস্পষ্ট ফুটে উঠল। সুইজারল্যান্ড বেড়াতে যাওয়া সব পর্যটকই ইন্টারলেকেন যায়, কেননা জায়গাটি হল বরফঢাকা উঁচু

পর্বতমালা গ্লেসিয়ার ইউমফ্রাউ দেখতে যাওয়ার বেসক্যাম্পের মতো। সেখানেই উঁচু জায়গা থেকে ছবি তোলার তাড়ায় প্রাচীন পিছল বরফে আছাড় খেয়ে হাঁটুতে প্রচণ্ড জোরে আঘাত পেলেন। বাম হাঁটু তালের মতো ফুলে গেল। আমি ছোট নোটবুকে কিছু টুকছি দেখে আমাকে কয়েকবারই অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সতর্ক করে বলেছিলেন, 'কী লিখছেন? এগুলো লিখবেন না কিন্তু। এগুলো গল্প করার জন্য।' তার ছবি তুলছিলাম ক্যামেরায়, বললেন, 'ছবি ফেসবুকে দেবেন না।'

মাহমুদ হাফিজ শ্রীঅমরেন্দ্র চক্রবর্তীর জীবনের কিছু অপ্রত্যাশিত ঘটনা শুনতে চাইলেন। যাতে চমক আছে, আছে মিরাকল। কথাটি শুনে তিনি বললেন, 'জীবনটাই তো একটি চমক। জীবনের চেয়ে বড়ো চমক আর নেই। তবে মিরাকল আসলে মনেরই কোনও না কোনও ভুল। কত কী ঘটে জীবনে, সেই স্মৃতির সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে জীবনের কথাই তো লিখি।' তিনি বললেন 'সেরূপ ঘটনা এতো আছে যে সব বলতে গেলে রাত্রি বারোটা বাজবে।'

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী কাল রাতের অসমাপ্ত লেখাটি সমাপ্ত করার জন্য একটু সময় চাইলেন। আর কয়েকটি লাইন লিখলেই তা শেষ হবে জানালেন। আমরা তখন দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলোর দিকে তাকাই, দেখতে থাকি। মনে মনে জানি এসব ছবি তাঁরই আঁকা, তবু বোকার মতো জিজ্ঞেস করি, 'এসব কি আপনার আঁকা?' সঙ্গে ছুঁড়ে দেই প্রশংসাসূচক বাক্য। 'চমৎকার সব ছবি।' তিনি মাথা নাড়েন, অর্থাৎ ওগুলো তাঁরই আঁকা। অনন্যা পাল ও আমি একমত হই যে ছবিগুলোতে ভ্রমণের ছাপ রয়েছে। শিল্পী যে একজন ভ্রামণিক, তা বোঝা যায়।

আমরা পানি খেতে চাইলে তিনি পাপিয়াকে জল দিতে বললেন। পাপিয়া পানি আনলে বললেন, পানি আর জল তো একই; পানি উর্দু শব্দ, জল বাংলা। নিহিতার্থে ভেদ নেই কোনও।

৩-৪ বছর আগে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী লন্ডনে একটি পর্যটন মেলায় আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। চারদিনের উৎসব, তিনি নিমন্ত্রণকর্তাদের বলেছিলেন, তিনি দু'দিনের বেশি থাকতে পারবেন না, কেননা জাপানে তাঁর কবিতা পড়ার আমন্ত্রণ ছিল। সেইমতো লন্ডনে দু'দিন থেকে সকালে কলকাতা ফিরে সন্ধ্যায়ই আবার দিল্লি হয়ে জাপান চলে যান। এর আগেও একবার দিল্লি থেকে পনেরো দিনে তখনকার অখণ্ড সোভিয়েত ইউনিয়ন ঘুরে এসে পরদিনই রোমে বিশ্ব সংবাদপত্র সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। এমনটা তার জীবনে বেশ কয়েকবার ঘটেছে। বেশিরভাগ সময় বিদেশে যান সংবাদপত্র বা পর্যটন বিষয়ক বিভিন্ন কনফারেন্সে যোগ দিতে। এভাবেই ভ্রমণ হয়। তারই ফাঁকে ফাঁকে হাত-ক্যামেরায় ভ্রমণচিত্র তৈরি করা। একবার আমেরিকা থেকে আমন্ত্রণ এসেছিল, বিশ্ব কবি সম্মেলনের সেই আমন্ত্রণপত্র ই-মেলে তিনি দেখেছিলেন ৯ মাস পরে। এতদিন খুলেও দেখেননি আমন্ত্রণপত্র ও তার অনেকগুলি রিমাইন্ডার এসেছে। সম্মেলনের শেষে উদ্যোক্তাদের একজন চিত্রানুরাগী শ্রী চক্রবর্তীকে তাঁর র‍্যাঞ্চে কয়েকদিন বেড়ানোর আয়োজন করেছিল। বিবিধ চাপে থাকেন, আমন্ত্রণও একধরণের চাপ।

মাহমুদ হাফিজ জানতে চান তার প্রথম ঘর ছেড়ে বাইরে আসার ঘটনা। সারাজীবন

যে মানুষটি পৃথিবী চষে বেড়াচ্ছেন, পা রেখেছেন আন্টার্কটিকা মহাদেশে, তার ভ্রমণের সূত্রপাত কী করে হল--- এটিই ছিল মাহমুদ হাফিজের জিজ্ঞাসা। এর উত্তরে তিনি জানালেন, প্রথম যখন পৃথিবীর টানে ঘর ছাড়েন তখন তিনি সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। তার স্কুলের বন্ধুর বাড়ি ছিল ধামুয়া। ধামুয়ার ধানখেত চিরে চলে যাওয়া খালে, বন্ধুটি ডোঙায় চড়িয়ে তাকে নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে বলল, জানো তো এই খাল ধরে সোজা গেলে ডায়মন্ডহারবার নদী। তা শুনে তিনি একদিন বাড়ি ছেড়ে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে মধ্যরাতের ট্রেনে চড়ে ডায়মন্ড হারবার স্টেশন পৌঁছলেন শেষ রাতে। সেখান থেকে বাসে চড়ে কাকদ্বীপ। আরেক বাসে চড়ে ভোরবেলা এসে নামলেন নামখানা। সামনেই হাতানিয়া-দোয়ানিয়া নদী। নদী পেরলেই বকখালি। ইচ্ছা ছিল বকখালি থেকে বিদেশগামী জাহাজে চড়ে বঙ্গোপসাগর পেরিয়ে ভারত মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর, অতলান্তিক মহাসাগরে ভেসে চলে যাবেন পৃথিবী সন্দর্শনে। বালকটি যে ঘর থেকে পালিয়েছে এটা টের পায় নামখানার সেচ বিভাগের বাংলোর মালি-কাম-কেয়ারটেকার। সে তাকে জিজ্ঞেস করেছিল,

'খোকা, কোথায় যাচ্ছ?'

তিনি বলেছিলেন এই নদী পেরিয়ে বকখালি-ফ্রেজারগঞ্জ গিয়ে বঙ্গোপসাগর থেকে বিদেশগামী জাহাজে চড়বেন।

মালী মানুষটি বলেছিল, ঠিক আছে, যেও। এখন একটু বিশ্রাম নাও, খাওয়া-দাওয়া করো। আমি তোমার জন্য খাবার নিয়ে আসছি।

বাংলোর উঁচু খাটের মোটা গদির বিছানায় কিশোর ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তার ঘুম যখন ভাঙে তখন ভর সন্ধে।

মালী তাকে বলে, 'বকখালির ওদিকটায় ডাকাতদের আখড়া। তোমার সবকিছু কেড়ে নিবে। আজ বাড়ি ফিরে যাও। পরে আরেকদিন এসো। তখন দিনের আলোয় নদী পেরিয়ে বকখালি-ফ্রেজারগঞ্জ থেকে জাহাজে উঠবে।'

বাড়ি ফিরে তিনি দেখতে পান হুলস্থুল কাণ্ড! হারানো ছেলেকে ফিরে পেয়ে অবশ্য বাড়ির সবার মনে স্বস্তি। তার সমুদ্রপথে বিশ্বদর্শনের স্বপ্ন টুটে গেল।

মাহমুদ হাফিজ হয়তো ভেবেছিলেন তিনি সেই সুদূর অতীতে কাকদ্বীপ গিয়েছিলেন, সাম্প্রতিক সময়ে যাননি। তাই নামখানা শুনে মাহমুদ হাফিজের আরেকটি প্রশ্ন ছিল, তিনি সাম্প্রতিক সময়ে নামখানা রেলস্টেশনটি দেখেছেন কি না? মাহমুদ হাফিজের মতে নামখানা রেলস্টেশন বাইরে থেকে ইউরোপের রেলস্টেশনগুলোর মতো সুন্দর। চমৎকার পরিচ্ছন্ন,ঝকঝকে ও তকতকে। নামখানার নাম শুনে মাহমুদ হাফিজের আরও মনে পড়ে যায় সেখানে হাতানিয়া দুয়ানিয়া নদীর উপর ব্রিজ তৈরি হয়েছে। একথা শুনে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী বললেন, এই নদীর উপর সেতু তৈরি হলে পর্যটকরা সরাসরি বকখালি গিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে--- একথা তিনি পঁয়ত্রিশ বছর আগে যুগান্তর পত্রিকায় লিখেছিলেন। তিনি একথাও লিখেছিলেন এ সেতু ভারতের প্রকৌশলীরাই তৈরি করতে পারবে, বিদেশি প্রকৌশলী আনার দরকার নেই।

জুল ভার্নের উপন্যাসে ফিলিয়াস ফগ ৮০ দিনে পৃথিবী পরিভ্রমণ করেছিলেন।

মাত্র কয়েক বছর আগে সেই পথে আশি দিনে পৃথিবী ঘুরে আসার একটি প্যাকেজের খোঁজ পেয়েছিলেন। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেও শেষ পর্যন্ত সেই পরিকল্পনা বাতিল করেন। বলেন, আশি দিনে পৃথিবীটা ভালো করে দেখা হবে না, ছবিও তোলা হবে না। তাছাড়া পৃথিবীর পথঘাট অনেক বদলে গেছে। আগে যেখানে ব্রিজ ছিল না, এখন সেখানে ব্রিজ হয়ে গেছে। রেললাইন ছিল না, রেললাইন হয়ে গেছে। জলপথ-স্থলপথ বদলে গেছে। পুরোটাই বদলে গেছে। সেবারও পৃথিবী দেখার স্বপ্নটা স্বপ্নই থেকে গিয়েছিল।

মাহমুদ হাফিজ ইংরেজি, বাংলা মিশিয়ে বললেন, দিনের শেষে (at the end of the day) আপনিই জয়ী। কেননা এই ক্রমশ জমে ওঠা অর্জন (cummulative achievement) আপনাকে শীর্ষে নিয়ে এসেছে। টুকরো টুকরো (scattered) ভ্রমণ জমে জমে বিপুল ভ্রমণ অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত হয়েছে।

তিনি আমাদের তিনজনকে তাঁর লেখা তিনটি বই উপহার দিলেন। এখন যে লেখাটি তিনি শেষ করার চেষ্টা করছেন এটি নিতে এসে কাল যে যুবক বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে গিয়েছিল, সে তাঁর খুব ভক্ত। সে নাকি প্রস্তাব করেছিল অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর দুটি গল্প, পাঁচটি কবিতা, একটি ভ্রমণকাহিনি, দুটি ছোটোদের জন্য লেখা নিয়ে আশি থেকে একশো পাতার একটি পাঁচমিশালী বই ছাপানোর। তিনি প্রশ্নবোধক চোখ তুললে যুবক বলেছিল, এটা হাজার হাজার মানুষ পড়বে, কেননা একের ভেতর তারা বহুমুখী বিস্ময়কর প্রতিভা অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর বিবিধ রচনার আস্বাদ পাবে। ওই উদ্ভট প্রস্তাবে তিনি স্বভাবতই রাজি হননি। তিনি যুবককে বললেন, 'ওই কথাটি (বহুমুখী বিস্ময়কর প্রতিভা) একবার বলেছ। দ্বিতীয়বার আর বলবে না।' এই অতিউৎসাহী যুবক ফেসবুকে তার একটি লেখার সঙ্গে ওই কথাটি লিখে রেখেছে। তিনি দেখামাত্র সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে লেখাটি মুছে ফেলতে বলেন। যুবক যখন বলেছিল সে তার বিশ্বাস থেকেই কথাটি লিখেছে, তখন তিনি বলেছিলেন, 'কিন্তু লেখাটা তো আমার বিষয়েই।' তিনি বললেন, 'এখানে আমি কোনও বিনয় দেখাইনি।' তার একথা থেকে বুঝলাম তিনি বিনয়ী মানুষ, নিজেকে মহৎ (বহুমুখী বিস্ময়কর প্রতিভা) দেখানোর বাসনা নেই। আরও বুঝলাম নিজের লেখাকে তিনি আগলে রাখেন; এ নিয়ে তার গর্ব রয়েছে, আর তাই তো স্বাভাবিক।

তিনি সেলিব্রেটি মানুষ, তার অগুন্তি পাঠক, ভক্তসংখ্যা বিপুল। ফেসবুকে হাজার হাজার ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট আসে। তার ভেতরে অধ্যাপক, শিল্পী, সম্পাদক, বিশেষ জ্ঞানীগুণী অনেকেই আছেন। অনেক অচেনাই উঁকিঝুঁকি মারে। কিন্তু তিনি খুব বাছাই করে বন্ধু তালিকা তৈরি করেন। আমার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'আপনার ফ্রেন্ড রিকোয়েস্টে তো কাল না যেন পরশু সায় জানালাম।' বস্তুত তিনি কাউকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠান না। যারা পাঠায় তাদের মধ্যে বাছাই করে গ্রহণ করেন। প্রাধান্য দেন পরিচিতজন ও লেখকদের। একবার কলকাতার বাইরের একজন কবি, ডাক্তার, আনন্দবাজারে আনন্দমেলায় প্রকাশিত তার একটি গল্প পড়ে এত মুগ্ধ হয়ে যান যে টেলিফোন করে নিজের ভালো লাগা ব্যক্ত করে বলেন, 'আপনার গল্পটা পড়ে মুগ্ধ হয়ে গেলাম।' তিনি সোজাসাপ্টা বলেছিলেন, 'এ কথা বলার জন্য ফোন করতে হয়?'

ডাক্তার মহাশয় খুব আহত বোধ করেছিলেন। পরে বলেছিলেন, 'আপনার কথা শুনে এত ব্যথা পেয়েছিলাম মনে। আপনি এত রূঢ় কথা বলেন।' তার উত্তর ছিল, 'লেখার সময় ব্যাঘাত ঘটিয়ে লেখার প্রশংসা শুনতে হলে আমি রূঢ় হয়ে যাই।' এও জানা গেল, তাঁর ভ্রাতৃসম এক বিখ্যাত নিউরোলজিস্ট, তিনিও কবি, প্রায়ই বলতেন, 'ভ্রমণ' পত্রিকায় তিনি যে সম্পাদকীয়গুলো লিখেছেন সেসব জড়ো করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করলে একটি অনবদ্য গ্রন্থ হবে। কেননা ওই সম্পাদকীয়গুলোর মাঝে পৃথিবী ধরা পড়েছে। সময়ের অভাবে তিনি নিজে তা করতে পারছিলেন না।

এতদিনে গত ২৭ বছরে তাঁর মাসিক লেখাগুলি গ্রন্থাকারে 'পথে পথেই দেশ' নামে প্রকাশের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। লেখাগুলি ছাড়াও ওই গ্রন্থে অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর তোলা প্রায় একশো রঙিন ছবিও থাকছে। তাঁর আরেক ভক্ত পাঠিকা প্রায়শই তাকে ফোন করে লেখার ব্যাঘাত ঘটাত। সৌজন্যবশত প্রথমটায় কিছু বলেননি, কিন্তু একদিন বিরক্ত হয়ে তাকে পুলিশের ভয় দেখালেন একথা বলে যে, মেয়েটির নাম্বার তিনি লালবাজারে পুলিশের কাছে জমা দিয়ে রেখেছেন। আসলে তেমন কিছুই করেননি, কেবল ঘাবড়ে দেবার জন্য কথাটা বলেছিলেন। নাছোড়বান্দা মেয়েটি তবু বলেছিল, 'টিভিতে আপনার গলা শুনি। আপনার সেই গলা শোনার জন্য ফোন করি।' এসব ঘটনা থেকে বোঝা যায় লেখালেখি তাঁর কতখানি প্রিয়। আর যখন লেখেন বিশ্বসংসার ভুলে থাকেন। আমার ধারণা এই লেখালেখি, ওই ছবি আঁকা তাঁকে কেবল বাঁচিয়ে রাখেনি, মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা দিয়ে রেখেছে। যৌবনের নায়কোচিত চেহারাটি না থাকলেও আশি বছর বয়সেও তিনি কান্তিমান পুরুষ। তিনি বললেন, তিনি কখনও কোনও সম্পাদককে জিজ্ঞেস করেন না তার সম্পাদিত পত্রিকাটি কি মাসিক না ত্রৈমাসিক। বেরুচ্ছে না কি বেরুচ্ছে না ইত্যাদি। বা কোনও লেখকের কাছে জানতে চান না, কী কী বই লিখছেন? বললেন, 'কিছু জানবার জন্য ওইটুকু পরিশ্রম যদি আমরা না করি তবে জানবার অধিকার কীভাবে জন্মাবে? একটি মন্দির বা মসজিদ বা গির্জা বা আর কিছু দেখতে গিয়ে আমরা কত পরিশ্রম করি, আর লেখালেখির কথা জানতে করব না!'

এবার ঢাকায় এক ভাড়া করা ট্যাক্সিতে চড়ে তাঁর শ্বাসকষ্ট হয়েছিল। বুঝতে পারছিলেন গাড়ির এসি থেকে বিষাক্ত গ্যাস বেরুচ্ছে। গাড়ির এসি যে মাঝে মাঝে সার্ভিসিং করাতে হয় চালক তা জানেই না। তিনি চালককে বললেন, 'তোমার নামে আমি পুলিশে কমপ্লেইন করব।' গাড়ি থেকে নামতেই সেই চালক আক্ষরিক অর্থেই তাঁর পায়ে পড়ে গেল। সে ভাড়াও নিতে চাইল না। তিনি জোর করে ভাড়া দিলেন, পুলিশে নালিশও করলেন না। শুকনো কাশি নিয়ে কলকাতায় ফিরে তিনি অ্যাপোলো হাসপাতালে গিয়েছিলেন। ডাক্তার তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হল কী করে (কাশি)? তিনি তখন বলেছিলেন, গাড়ির ভিতর এসির গ্যাস থেকে তৈরি পলিউশনের কথা।

একবার তিনি ৭২ দিনে ১১টি দেশ ভ্রমণের একটি ট্যুরে যাবার জন্য বেরিয়ে পড়েছিলেন। ইস্তাম্বুল থেকে পুরোটা গাড়িতে। সবশেষে সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে কলকাতা। কলকাতা থেকে এমিরেটস বিমান সংস্থার বিমানে চড়ে প্রথমে গেলেন ইস্তাম্বুল। সেখানে গিয়ে দেখেন বিমানবন্দরে তাঁকে রিসিভ করতে যাঁদের আসার

কথা ছিল তাঁরা আসেননি। যে হোটেলে থাকার কথা, সেখানে তাঁর নামে কোনও বুকিং নেই। যাই হোক শেষ পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গেই তিনটি মাত্র দেশ ঘুরে ফিরে আসেন। এরপরে ইরান ও আর্মেনিয়া হয়ে বৈকাল হ্রদে একরাত্রি কাটিয়ে রাশিয়া যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু যে গাড়িতে ঘুরছিলেন সেই গাড়ির চালক তথা মালিকের অসৎ মনোভাবের প্রতিবাদে তিনি ভ্রমণ পরিকল্পনা ত্যাগ করে ভারতে ফিরে আসেন। ভিসা থাকা সত্ত্বেও ইরানের পথে আর এগোলেন না। আর্মেনিয়ায়ও যাওয়া হয়নি। রাশিয়াতেও আর ঢোকা হল না। বৈকাল হ্রদে ভ্রমণ, সেখান থেকে সাইবেরিয়া হয়ে রাশিয়া ঘুরতে ঘুরতে যাবেন সেন্ট পিটার্সবার্গ— এই ছিল পরিকল্পনা। সব বাতিল করে দিলেন। তিনি অবশ্য এর আগে দু'বার মস্কো ও সেন্ট পিটার্সবার্গ ভ্রমণ করেছিলেন। ১৯৮৮ সালে মস্কোর রেড স্কোয়্যারে মিখাইল গর্বাচেভের বক্তৃতা শুনেছিলেন। এরপরে আবার গর্বাচভের সঙ্গে দেখা হয় ২০০৬ সালে লাঞ্চ মিটিংয়ে। ওয়ার্ল্ড এডিটর্স ফোরাম ৬০ জন সম্পাদকের সঙ্গে গর্বাচভের লাঞ্চের আয়োজন করেছিল। ওই সময়, ওই এডিটর্স ফোরামে নিউজ পেপার্স-এর কংগ্রেসে ২০০৬ সালে দেখেন ভ্লাদিমির পুতিনকে। ওই সম্মেলনে পুতিন এসেছিলেন বক্তা হয়ে। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী একটি বইতে এসব ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন।

আমার প্রতি ইঙ্গিত করে মাহমুদ হাফিজ বললেন, 'কামরুল হাসান আমার ভ্রামণিক বন্ধু। আমরা একসঙ্গে চেরাপুঞ্জি, হলদিয়া, বকখালি ভ্রমণ করেছি। কিন্তু আমাদের ভ্রমণের অ্যাপ্রোচ বিপরীত। যে কোনও নতুন স্থান বা দেশভ্রমণের আগে কামরুল হাসান সে স্থান বা দেশ সম্পর্কে প্রায় কিছু না জেনে, ইতিহাস, ভূগোল না জেনেই চলে যায়। কিছুই জানেন না, উদভ্রান্তের মতো যান। এর ফলে তিনি অদেখা ও অজানাকে একেবারে আনকোড়া দেখা ও জানার বিস্ময়জনিত আনন্দ পান। কিন্তু আমি হচ্ছি এর ঠিক বিপরীত। আমি ভ্রমণের আগে সে দেশ সম্পর্কে উইকিপিডিয়া ঘেঁটে যতদূর জানা সম্ভব জেনে রওয়ানা হই। এর সুবিধা হল ঠকবার সম্ভাবনা কমে যায়, পরিকল্পনা করা যায় ভালোভাবে, অর্থ সাশ্রয় হয়। যেমন আমরা গুয়াহাটির কামাখ্যা মন্দিরে গেছি, কামরুল হাসান এর ইতিহাস বা ভূগোল কিছুই না জেনে গেছেন, ইতিহাস ও ভূগোল তিনি পরে জুড়ে দিয়েছেন। আমি উইকিপিডিয়া ঘেঁটে ইতিহাস জেনে কামাখ্যা গিয়েছি। কামরুল ভাই উজবেকিস্তান গিয়েছিলেন। সেখানকার ইতিহাস তার বইতে পরে যুক্ত করেছেন, আগে নয়।' এই তুলনা টেনে মাহমুদ হাফিজ শ্রীঅমরেন্দ্র চক্রবর্তীকে প্রশ্ন করলেন,

'এই দুই বিপরীত অ্যাপ্রোচের কোনটি আপনি পছন্দ করেন?'

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি কামরুলের মতো। আমিও পূর্ব ধারণা ছাড়া কোথাও যেতে এবং নব আবিষ্কারের আনন্দে উৎফুল্ল হতে ভালোবাসি। তবে, জায়গাটার ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট কিছু তো জানতেই হয়। ভ্রমণে মন থাকবে সাদা ক্যানভাসের মতো।'

একথা শুনে আমি আহ্লাদিত অনুভব করি। তিনি বললেন, প্রায়শই তার বিদেশ যাত্রা ঘটে অফিস থেকে গাড়িতে সোজা এয়ারপোর্ট চলে যাওয়ার মধ্য দিয়ে। তিনি এত কাজে ব্যস্ত থাকেন যে ফ্লাইট ধরার আগে পর্যন্ত তাকে কাজ করে যেতে হয়।

গাড়িতে বসে সেক্রেটারিকে অফিসের কাজের নির্দেশ দেন। এয়ারপোর্টে বসেও ফোনে বিদেশযাত্রার কাগজপত্র ঠিক করেন, প্লেনে উঠে তাঁর কনফারেন্সের কাগজপত্র পড়েন, ভ্রমণ সংক্রান্ত কাগজ গোছাতে থাকেন।

একটানা কথাবার্তায় বোধহয় ক্লান্ত হয়েই তিনি তাঁর একটি ছোট কবিতার বই বের করে সেখান থেকে পড়তে শুরু করলেন। বললেন, সেটি তাঁর একটি প্রিয় বই। আলাপচারিতা যত এগুতে লাগল তিনি তত সহজ হয়ে উঠলেন, প্রথমদিককার সেই দূরত্ব, গাম্ভীর্য আর নেই। তিনি বেশ কয়েকটি দু'লাইনের কবিতা পাঠ করে শোনালেন।

১। মন্দিরে পূজাই দাও, মসজিদে নামাজ
মানুষ সবাই এক, ভুললে শিরে বাজ।

২। মন থেকে চায় না যারা অপরের ভালো
তারা কিন্তু জীবনের দূষণ ছড়ালো।

৩। আরোগ্যের বিনিময়ে অর্থের লালসা
জীবন আনন্দ খেয়ে ফেলে রাখে খোসা।

৪। সত্য মিথ্যা বিচার্য স্বার্থের নিরিখে
সমাজ দূষিত হয় যাই আজ লিখে।

৫। মিথ্যা যদি ঝলমলায় সত্যের পোশাকে
এক ভেবে নেয় লোকে শাঁস ও খোসাকে।

মাহমুদ হাফিজ জানালেন, তিনি এই কবিতাগুলো পড়েছেন। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী তাকে বইটি হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়েছিলেন। মাহমুদ হাফিজ এই দ্বিপদীগুলির সঙ্গে হুমায়ূন আজাদের প্রবচনগুচ্ছের সাদৃশ্য আছে বলে জানালেন, কেননা এতে রয়েছে জীবনজিজ্ঞাসা ও তার উত্তর, জীবন অভিজ্ঞতার নির্যাস। আমি বললাম, আঙ্গিকের দিক থেকে এগুলো উর্দু গজলের মতো বা খনার বচনের মতো। বইটির নামও খনার বচনের কাছাকাছি--- 'ক্ষণের বচন'। নিজেকে চিহ্নিত করেছেন ক্ষণকথক হিসেবে। তখন ৫ লাইনের লিমেরিক, ৪ লাইনের রুবাইয়া ও চতুর্পদী নিয়ে আলোচনা হল। আমি জানালাম যে, 'আমি একটা সময়ে অনেক চতুর্পদী লিখেছি। দুটো বই আছে কেবল চতুর্পদী দিয়ে, আরও দু-তিনটি বই হতে পারে।' শ্রীঅমরেন্দ্র চক্রবর্তী প্রশংসাসূচক মাথা নাড়ালেন।

তাঁর সম্পাদিত 'কালের কষ্টিপাথর' পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় লম্বালম্বি আধপাতা জুড়ে বের হত মৈত্রেয়ী নাগের কৌতুকময় নতুন শব্দের সন্ধান 'শব্দবক্র'। বাকি আধখানা পাতা নিয়ে কী করবেন ভেবে পান না, তখন লিখতে শুরু করলেন দু'লাইনের অভিভাবনামূলক দ্বৈতপঙক্তির কবিতা 'ক্ষণের বচন'। কখনও তাতেও

সেই আধপাতা না ভরলে তিনি কবিতার সঙ্গে স্কেচ এঁকে দেন। এই হল 'ক্ষণের বচন' লেখার প্রেক্ষাপট।

অনন্যা পাল ও আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে ঘরটির ছয় দেওয়ালে, এবং অন্য ঘরের দেওয়ালেও, এমনকি প্যাসেজে টাঙানো তার আঁকা ছবিগুলো দেখছিলাম। পুরো বাড়িটিকে একটি আর্ট গ্যালারি মনে হল। মানুষটি যে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কেমন তাঁর ছবি? আমার কাছে মনে হল তাঁর ছবি সারিয়ালিস্টিক বা পরাবাস্তববাদী। গাঢ় রঙের ব্যবহার আছে, আমাদের চেনাশোনা পাখি ও প্রাণী যেমন আছে, তেমনি আছে কল্পিত সব প্রাণী। আছে মানুষ, মানুষের আদিমতা। একজন শিল্পসমালোচকের মতে, এই আদিমতা ধারণে তিনি এক্সপ্রেশনিজম ও কিউবিজমের একটি মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। আমার মনে হল এক্সপ্রেশনিজম ও ইম্প্রেশনিজম। কবি বলেই তাঁর ছবিতে আছে প্রতীক ও রূপক। বলার চেয়ে না বলাটাই বেশি। একটি ছবির কথা খুব তীক্ষ্ণ মনে আছে। একটি অতিকায় ঠোঁটের পাখি শায়িত মানুষের গলায় কামড় বসিয়েছে। এখন যখন করোনা এসে মানুষের গলায় প্রথম হুল ফোটায়, তখন মনে হল ভবিষ্যতের মহামারীর চিত্রটি তিনি আগেই এঁকে রেখেছিলেন। কবি ও শিল্পীদের এইজন্যই ভবিষ্যৎদ্রষ্টা বলা হয়। আরেকটি ছবিতে চারটি প্রধান ধর্মের উপাসনালয়ের প্রতীকি ছবিতে একজন মানুষ, এ ছবিতেও শায়িত, তার হাতে গজিয়ে ওঠা একটি স্বপ্নের বৃক্ষ, যদিও নীচেই বৃক্ষনিধনের চিত্র, সময়-ঘড়ির কাঁটাও ঘুরছে। উপাসনালয়গুলোকে আক্রমণ করেছে একদল কাক। বুঝি এ ছবি প্রতীকি ও এক্সপ্রেশনিস্ট। ঢেউখেলানো লাল সবুজের এক প্রান্তর, নীলাকাশ ও সাদা মেঘেরা, গাছপালা--- সবই ঢেউখেলানো--- তুলে আনে এক প্রকৃতিপ্রেমী ভ্রামণিকের পৃথিবী। এ ছবিটি ইমপ্রেশনিস্ট ঘরানার। তাঁর ছবির একক চিত্রপ্রদর্শনী ড্রিম অনুষ্ঠিত হয় ২০১৪ সালে। দ্বিতীয় একক প্রদর্শনী ভায়োলেন্স প্রদর্শিত হয় ২০১৬ সালে। দুটিই আইসিসিআর-এর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্যালারিতে। আগামী বছর তিনি তৃতীয় একক চিত্র প্রদর্শনী পরিকল্পনা করছেন; সে উদ্দেশ্যে ছবিও আঁকছেন। যদিও কোভিড-১৯ এসে দুনিয়া লণ্ডভণ্ড করা তাণ্ডব চালিয়েছে, তাতে পণ্ড হয়নি তাঁর ছবি আঁকা। করোনা-উত্তর পৃথিবীতে আশা করি প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হবে। তাঁর ছবি দেখে মাহমুদ হাফিজ বললেন, 'অনুমান করি আপনি কোনও আর্ট স্কুলে ছবি আঁকা শেখেননি, তাহলে ছবি আঁকা কীভাবে এল?' এর উত্তরে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী বললেন, 'ছবি নিজে থেকেই আঁকা হয়ে যায় হয়তো।' নিজের ছবি আঁকা সম্পর্ক তাঁর কথা, তিনি নিজেও জানেন না কী করে একটি ছবি ক্যানভাসে ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে। আমার মনে হল, সেই পূর্বপরিকল্পনা ছাড়াই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়া, মগজের সাদা ক্যানভাসে নব নব দর্শনের ছবি ফোটানো।

তিনি আমাদের তাদের বাড়ির ছাদে নিয়ে গেলেন। এই অ্যাপার্টমেন্ট হাউজের ছাদটি কেবল তাঁর, অন্য ফ্ল্যাটমালিক বা ভাড়াটেদের সেখানে প্রবেশাধিকার হয়তো আছে, অধিকার নেই। ছাদে গিয়ে দেখি সর্বাণী ম্যাডাম প্রান্তকে, বায়োলজি বইয়ের বাইরে বৃক্ষহীন ঢাকা শহরে যে তেমন কোনও গাছপালা দেখেনি, দেখলেও তাদের নাম জানে না, বিভিন্ন ফুল ও গাছ চেনাচ্ছেন। বুঝলাম আজ ওর একটি ভালো বোটানি

ক্লাস হবে। ছাদটি ভরে আছে বিভিন্ন ফুল, ফল ও সবজির গাছে। আমরাও তো চিনি না বেশিরভাগ গাছপালা, আমরাও বোটানি ক্লাসের ছাত্র হয়ে গেলাম। এ ক্লাসে শিক্ষক দুজন। তারা বেশ আগ্রহের সঙ্গে আমাদের অচেনা (কিছু কিছু অবশ্য আমরা চিনি) ফুলদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন। দেখলাম আমরা সবজি যত চিনি, ফুল তত চিনি না। এর কারণও বোধগম্য না হওয়ার কোনও কারণ নেই। প্রথমটি খাদ্য, দ্বিতীয়টি শিল্প। প্রথম পয়সাটি খাদ্যের পেছনেই যায়; দ্বিতীয় পয়সা প্রায়শই মেলে না, ফলে ফুলও কেনা হয় না। সেই ছাদে যেমন রয়েছে কেয়া গাছের ঝোপ, তেমনি বাঁশগাছের ঝাড়; আছে চন্দ্রমল্লিকার ঝোপ। অনেক নতুন ফুলের নাম শিখি এ বাগান থেকে, শিখি আর ভুলে যাই। যেমন কোলাঞ্চো, যেমন স্ন্যাপ ড্রাগন, যেমন পর্টুলিকা। ওলিসাম কি কখনও শুনেছি, কিংবা হলি হক? আমি প্রথমে শুনেছিলাম হ্যান্ডসাম ও লিলি হক। স্যালাভিয়া, অ্যাসটার, স্যুলেশিয়া এসকল ফুলের নানা রং। অচেনা ভারবিনার তিনটি রং--- সাদা, গাঢ় বেগুনি ও হালকা বেগুনি; চেনা গাঁদার চারটি। কসমস, স্যুলেশিয়া, বোগেনভেলিয়া, প্যানজি সবগুলো ফুলেরই বেশ কিছু প্রকার রঙের। আরও ছিল অ্যাডেনিয়া, টেকোমা, ফ্লক্স, পপি, ক্যালেন্ডুলা, কৃষ্ণচূড়া, ডায়ানথাস, ন্যাস্টারশিয়াম, জবা ও ডালিয়া। এ যেন দেশি আর বিদেশির একত্রিত পার্টি, চেনা আর অচেনার সমারোহ। জগতে এত ফুল না চিনে কী করে এত বছর কাটিয়ে দিলাম বা কবি হয়ে উঠলাম, তাই সবিস্ময়ে ভাবি।

দেখলাম সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি, অমরেন্দ্র চক্রবর্তী, অন্তরঙ্গ হয়ে উঠছেন। প্রথম দিকে যেমন শামুকের মতো নিজেকে খোলসে আটকে রেখেছিলেন, ধীরে তা থেকে নিজেকে বের করলেন; ছাদে এসে হয়ে উঠলেন একবারে দিলখোলা। অনেক নতুন গুল্ম, বিশেষ করে ফুল ও অর্কিড দেখা হল। তাদের আহারের অনেক সবজি তারা ছাদের বাগান থেকেই তুলে নেন। ছাদে সবেদা, পেয়ারা, লেবু দেখে আশ্চর্য হইনি, আশ্চর্য হয়েছি খেজুর গাছ দেখে। ফুল, সবজি আর ফলের গাছের সেই সবুজ ছাদ হতে দক্ষিণ কলকাতার দালানঠাসা আকাশদৃশ্য ভালো লাগল। কাছেই চওড়া সড়ক। দিনটি ছিল জানুয়ারির মায়াবী রোদে ভরা, আকাশ উজ্জ্বল। মাহমুদ হাফিজ ও আমার মোবাইলের মেমোরি ভরে উঠে ফুল আর গুল্মের ছবিতে।

কিশোরদের জন্য লেখা তাঁর তিনটি রচনা 'শাদা ঘোড়া', 'হীরু ডাকাত' ও 'আমাজনের জঙ্গলে' ছোটোদের মাঝে খুব জনপ্রিয়। বড়োরাও এসব কিশোর গল্পের স্বাদ নেন। কবি জয় গোস্বামী লিখেছেন, 'হীরু ডাকাত' বইটি পড়ে তিনি ছন্দের অনেক খুঁটিনাটি জিনিস শিখেছেন। বইটির কাছে অকপটে ঋণ স্বীকার করেছেন বাংলা ভাষার এই শক্তিমান কবি। এ বইগুলোর প্রচ্ছদ, বিশেষ করে 'শাদা ঘোড়া'র প্রচ্ছদ দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। 'শাদা ঘোড়া' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল আনন্দবাজারের শিশুদের পাতায়। আনন্দ পাবলিশার্স থেকেই পূর্ণেন্দু পত্রীর আঁকা প্রচ্ছদে বইটি বেরয় ১৯৭৯ সালে। এই বইটি জার্মান, মোঙ্গোলীয়, ইংরেজি-সহ অনেকগুলো ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাঁর শিশুসাহিত্যিক পরিচয়টিই বড়ো এবং তা যথার্থ বটে। তবে আমাদের কাছে তার বড়ো পরিচয় তিনি বিশ্বভ্রামণিক ও ভ্রমণলেখক। সম্প্রতি তার এগারোটি ভ্রমণকাহিনি একত্র করে বই প্রকাশিত হল।

ভ্রমণকাহিনিগুলো হল--- 'পাহাড়ি গরিলার খোঁজে', 'বল্গাহরিণের খোঁজে', 'রাজা শিয়ালগানের গ্রামে', 'অমিত লাবণ্যের দেশে' ইত্যাদি। এগারোটি সত্য ঘটনার সঙ্গে চব্বিশটি দুর্লভ রঙিন ছবি। তারই তোলা। ভিডিও ও স্টিল ছবি দেখে অনেকেই ভাবে তিনি দামী ক্যামেরার প্রখর লেন্স ব্যবহার করেন, ভাবেন তিনি পেশাদার আলোকচিত্রশিল্পী। অনেকেই তাই ফোটোগ্রাফি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, তিনি কোন ক্যামেরা ব্যবহার করেন। ক্যামেরা, তা যতই দামী হোক, ভালো ছবি তুলতে পারে না, যদি না ছবি তোলা মানুষটির শৈল্পিক চোখ থাকে।

তাঁর উপহার দেওয়া উনিশটি গল্পের সমাহার 'চোখে দেখা গল্প' বইটি বাংলাদেশে ফিরে এসে পড়ে ফেলি। চোখে দেখা তো আর গল্প নয়, এগুলো সবই সত্যি ঘটনা। এর মাঝে আফ্রিকার সেৎসি মাছির গল্পটি পেলাম। এ গ্রন্থে প্রথম ঘটনাটি মধ্যপ্রদেশের পাহাড় আর জঙ্গল বেষ্টিত চিত্রকূটের বন্ধুস্বভাবী বানরদের নিয়ে আর শেষ ঘটনাটি আফ্রিকার রুয়ান্ডার জঙ্গলে কাছ থেকে দেখা গরিলা নিয়ে। যিনি বিপদ উপেক্ষা করে গরিলা দেখতে যান, তিনি যে সাহসী ও অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। চিত্রকূটের বানরদের একেবারে মাঝে গিয়ে তিনি বসেছিলেন, আর খুব কাছে থেকে ভয়ঙ্কর গরিলার ছবি তুলেছেন। মানবজাতির এই দুই ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছাড়াও প্রাণীকূলের মাঝে যাদের সঙ্গে আমাদের বায়োলজিকাল মিলটি সর্বাধিক সেই স্তন্যপায়ী জীবের রাজসিক প্রতিনিধি বাঘ রয়েছে এ বইতে। তবে এ বাঘ বনের বাঘ নয়, উঠোনের বাঘ। হিংস্র নয়, নিরীহ, ফিডারে করে দুধ খাওয়া বাঘশিশু। বইতে আছে বেশ কিছু ব্যাতিক্রমী, সাহসী মানুষের কথা। এদের একজন জুনপুটের সন্তোষ মাঝি উত্তাল সমুদ্রে যে মাছ ধরে বেড়ায়। আরেক মজার চরিত্র ফরাসি দেশের একশো বছরের পুরনো এক ডাকাত-বাড়িতে সাক্ষাৎ পাওয়া অ্যানায়েল। তার অ্যাডভেঞ্চার ও ভ্রমণপ্রিয় মন তাকে নিয়ে গেছে সিরিয়ার বেদুইনদের তাঁবুতে, মঙ্গোলিয়ার যাযাবরদের তাঁবুতে। পৃথিবী গ্রহের এমনি অনেক বিচিত্র তাঁবুতে তিনি প্রবেশ করেছেন অবলীলায় আর তুলে এনেছেন অজানা সব গল্প। তার দুঃসাহসিকতার পেছনে থাকে নতুন অভিজ্ঞতা লাভের অদম্য ইচ্ছা। একবার শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোর নেগম্বো সমুদ্রসৈকত থেকে গাছের ডালের তৈরি ক্যাটাম্যারান নামক ভেলায় চড়ে তিনি ভারত মহাসাগরে যাত্রা করেছিলেন সমুদ্রঢেউ উপেক্ষা করেই।

এই বইতে পাই বুলগারিয়ার গোলাপরাজ্য কাজানলাকে দেখা সেখানকার গোলাপরানি নির্বাচনের বর্ণাঢ্য উৎসব। লংকাদেশের অশোকবনের পৌরাণিক বিবরণের সঙ্গে বাস্তবের অমিল, গ্রিস সংলগ্ন সাইপ্রাস দ্বীপের ভূগোল, গভীর রাত্তিরে দুপুরের রোদে ভরা দেশ নরওয়ের বর্ণনা। পাই চিনদেশের শিয়ানরাজ্যের আকাশছাওয়া বিচিত্র সব ঘুড়ি, নীলনদের ফেরিওলাদের, যাদের লেখক প্রথমে ভেবেছিলেন জলদস্যু, তাদের দেখা। এ বই থেকেই জানলাম ভয়ঙ্কর দর্শন গরিলা এমনিতে ভয়ঙ্কর নয়, কেবল তার চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে থাকলে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে, তখন আক্রমণ করে। তাঁর বই পড়ে পাঠক যেমন ভ্রমণের আনন্দ পাবেন, তেমনি নতুন অনেক কিছু শিখবেন। ভ্রমণ মানেই তো শেখা। আফ্রিকার কেনিয়ায় মাসাই উপজাতিদের গ্রামে গিয়ে লেখক দেখেছেন কাঠ ঘষে আগুন জ্বালানো,

মিশরের রাজধানী কায়রোরর দোকানে দেখেছেন প্রথম কাগজ বানানোর প্যাপিরাস গাছের বাকল। প্যাপিরাস হোক আর অশোকবন হোক তিনি পুরাণ ও ইতিহাস খুঁজেছেন, পেয়েছেন ভূগোলের দেখা, সেসব ভূগোলে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল মানুষ। তিনি গল্প বলেন চমকার ঢঙে, সরল চালে। জটিল নয়, এমন এক প্রবহমান গদ্য তার হাতে অটুট। তার কথামালা পাঠককে টেনে রাখে।

এই অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় মানুষটি নিত্য নতুন অভিজ্ঞতার স্বাদ নিতে গিয়ে কম বিড়ম্বনার মাঝে পড়েননি। একবার ট্রেনে জার্মানির বার্লিন থেকে সুইজারল্যান্ডের ইন্টারলাকেন যাচ্ছিলেন। ট্রেনে বসে তিনি লিখছিলেন, আগের বছরের উত্তরমেরু প্রদেশে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা-নির্ভর তাঁর ভ্রমণকাহিনি, 'বল্গা হরিণের খোঁজে'। পথে এক জায়গায় ট্রেনকে সমুদ্র পাড়ি দিতে হবে। ট্রেন চড়ল জাহাজে। মাইকে ঘোষণা করা হল, যাত্রীরা সবাই জাহাজের ন-তলায় উঠে লাঞ্চ সেরে নিন। ট্রেন রইল জাহাজের পেটে। দৃশ্যপাগল অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সরু ঘোরানো লোহার সিঁড়ি বেয়ে ন-তলায় উঠে চারদিকের ছবি তোলায় মগ্ন হয়ে গেলেন। হঠাৎই একসময় মাইকে জাহাজ তীরে নোঙর করছে, ট্রেন জাহাজ থেকে নেমে যাবে কানে যেতেই তিনি পড়ি-মরি করে লোহার সিঁড়িতে পা দেবার মুহূর্তে কিচেন কর্নারের এক পরিচারিকা আগুন-গরম মোটা ফিশ ফ্রাই এগিয়ে ধরলেন। ভারী কাঁটায় তুলে কামড় বসাতেই তাঁর জিভ পুড়ে গেল, সেই জ্বালা ছাড়িয়ে ব্যথায় টাঁটিয়ে উঠল তাঁর সামনের দাঁত। কাঁটার উপর অসতর্ক কামড় পড়েছে। প্রচণ্ড জোর আঘাতে দুটি দাঁত নড়ে গেল।

আরেকবার, এই তো সেদিন, ছোট জাহাজে চড়ে ভেনিস সংলগ্ন এক দ্বীপ বুরানোয় গিয়ে এক বিখ্যাত কাচের কারখানায় তিনি অসাবধানতায় কাচের জ্বলন্ত ঘোড়া ছুঁয়ে হাতের তিন আঙুল পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। ছবি তোলার সময় ঘোড়ার মুখটি ক্যামেরার দিকে ঘুরিয়ে দিতে গিয়েই ওই বিপত্তি। ব্যান্ডেজ বাঁধা পোড়া আঙুল নিয়ে ইতালি ঘুরে ঘুরে ছবি তুলেছিলেন। কষ্ট হয়েছিল, ছবি তোলা থামেনি। মঙ্গোলিয়ায় বিশ্ব কবি সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়ে রাজধানী উলানবাটর থেকে জিপে করে গোবি মরুভূমি অভিযানের পরিকল্পনার ইতি ঘটে স্টেজে সিঁড়ি দিয়ে না উঠে লাফ দিয়ে উঠতে গিয়ে হাঁটুতে চোট পাওয়ার দুর্ঘটনায়।

কয়েকবছর আগে তিনি সংঘর্ষ ও বিবাদে রক্তাক্ত মধ্যপ্রাচ্য ঘুরে আসেন। লেবাননের রাজধানী বেইরুট থেকে সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাসে যান পালমিরার প্রত্নরত্ন দেখার তীব্র আকর্ষণে, পাড়ি দেন মরুভূমির ১২৫ কিলোমিটার পথ। ক্যামেরায় তুলে আনেন পালমিরা শহরের ধ্বংসাবশেষ। পালমিরা থেকে পরদিন যান বসরায়, তুলে আনেন সেখানকার বিখ্যাত অ্যাম্ফিথিয়েটারের ছবি। মনে হয় ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেল তাকে অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে পাঠিয়েছিল, ছবিগুলো তেমনি ঝকঝকে। হোক পাহাড় কিংবা মরুভূমি, অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর পা ক্লান্তিহীন। মঙ্গোলিয়ার গোবি মরুভূমি যাত্রা নিয়ে লিখেছেন কিশোর উপন্যাস।

শ্রীঅমরেন্দ্র চক্রবর্তী 'ভ্রমণ' পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশ করেন ১৯৯২ সালে। বইয়ের চেয়ে বড় একটা বিশেষ সাইজের পত্রিকাটির উজ্জ্বল হলুদ রঙের প্রচ্ছদ চোখ টানে। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক পত্রিকার সঙ্গে একটি মিল আছে প্রচ্ছদের। ভেতরে ঝলমলে

সব ফটোর মাঝে পশুপাখির ছবিও কম নয়। 'ভ্রমণ' পত্রিকায় যেমন রয়েছে ভ্রমণসাহিত্য, তেমনি রয়েছে ভ্রমণের তথ্য, যেমনটা থাকে ভ্রমণ গাইডে। দুয়ে মিলে ভ্রমণপিপাসুদের মাঝে খুব জনপ্রিয় পত্রিকাটি। বাংলায় প্রকাশিত ও সবচেয়ে বেশি প্রচারিত ভ্রমণ বিষয়ক পত্রিকা 'ভ্রমণ'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সম্পাদক হিসেবেই তাকে আমরা চিনি। কিন্তু তিনি যে 'কালের কষ্টিপাথর', 'ছেলেবেলা', 'কর্মক্ষেত্র' ও 'কবিতা-পরিচয়' নামের আরও চারটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন তা আমাদের জানা ছিল না। ষাটের দশকে তাঁর ছাত্রবয়সেই শেষোক্ত পত্রিকাটি কলকাতার কাব্যভুবনে আলোড়ন ও অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল। একটি কবিতার পুঙ্খানাপুঙ্খ আলোচনার যে রীতি 'কবিতা-পরিচয়'-এ মুদ্রিত হয়েছিল, তা ছিল অভিনব। কিংবদন্তিপত্রিকাটির সব কটি সংকলনের লেখাগুলি পরে একসঙ্গে 'কবিতা-পরিচয়' নামেই একটি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন অমরেন্দ্র চক্রবর্তী। এতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে থেকে শুরু করে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার পর্যন্ত ২১ জন কবির চল্লিশটি কবিতা নিয়ে আলোচনা করেছেন বুদ্ধদেব বসু, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অরুণ সরকার, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত প্রমুখ কবি। 'কবিতা-পরিচয়'-এর কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন জয় গোস্বামী। তিনি যে সংবাদ 'প্রতিদিন'-এর সাপ্তাহিক রোববার পত্রিকায় গোসাঁইবাগান নামের সিরিজে কবিতা নিয়ে আলোচনা করেছেন সেই আলোচনার ধারণাটি পেয়েছিলেন অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর 'কবিতা-পরিচয়' পত্রিকা থেকে। ঢাকায় এক আড্ডায় দেখা হওয়ামাত্র শামসুর রাহমান তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কবিতা-পরিচয়' ফের প্রকাশ করা যায় কিনা? বুদ্ধদেব বসু তাঁর শারদীয় লেখার ব্যস্ততার মধ্যেও 'কবিতা-পরিচয়'-এর জন্য সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'নৌকোডুবি' কবিতার বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন।

তাঁর সম্পাদনার ইতিহাসটিকে একটু দীর্ঘই বলতে হবে। স্কুল জীবনেই তিনি একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন। পরে 'ছেলেবেলা' নামে ছোটদের একটি সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। অচিরেই পত্রিকাটি পাঠকদের মাঝে সাড়া ফেলে। তাঁর 'কর্মক্ষেত্র' পত্রিকাটি শিক্ষিত বেকার যুবকদের স্বনির্ভর কর্মসংস্থানের পথ দেখায়। এটি ছিল ওই ধরনের প্রথম পত্রিকা যা এক দশকের মধ্যে প্রচার সংখ্যায় সব বাংলা পত্রিকাকে ছাড়িয়ে যায়। ২০১৪ সালে তিনি প্রকাশ করেন 'নারীযুগ'। বলা হয়, এটাই ভারতে কেবলমাত্র নারীদের জন্য প্রকাশিত প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র। ১৯৮৩ সালে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী প্রতিষ্ঠিত স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড নামের প্রকাশনী সংস্থা থেকেই পত্রিকাগুলো প্রকাশিত হয়। তিনি এর কর্ণধার। একক প্রচেষ্টায় তিনি এই সাহসী উদ্যোগটি নিয়েছিলেন, প্রাথমিক প্রতিকূলতাও কাটিয়েছিলেন, কিন্তু অর্থাভাবে পত্রিকাটি চালাতে পারেননি। প্রকাশনার মাত্র চার মাস পরে 'নারীযুগ' বন্ধ হয়ে যায়। সাম্প্রতিক সময়ে নারীর উপর সহিংসতা, বিশেষ করে ধর্ষণ, বেড়ে যাওয়ায় তিনি ২০১৪ সালের ১২ ফেব্রুয়ারিতে 'নারীযুগ'-এ প্রকাশিত লিড নিউজ ফেসবুকে প্রচার করেছেন। শিরোনামটি হল 'রাক্ষসকে রাস্তায় রুখে দিন'। এখানে আত্মরক্ষায় নারীর দশটি অস্ত্রের কথা বলা হয়েছে। 'নারীযুগ' পত্রিকায় শহিদ জননী জাহানারা ইমামের একাত্তরের দিনগুলি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেছিলেন বইটির প্রকাশক গাজী

শাহাবুদ্দিনের সম্মতি নিয়ে। গাজী শাহাবুদ্দিনের সঙ্গে তাঁর বেশ সখ্য ছিল। একবার কলকাতায় সপরিবার শ্রীচক্রবর্তীর গৃহে আতিথ্য নিয়েছিলেন।

শ্রীঅমরেন্দ্র চক্রবর্তী ১৯৪১ সালের ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের শ্রীরামপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃভূমি বাংলাদেশের বরিশাল। দেশভাগের বহু পূর্বে তাঁর পিতা বরিশাল থেকে কলকাতায় চলে আসেন ও কিছুদিন কলকাতায় ও শ্রীরামপুরে ভাড়া বাড়িতে থাকার পর বারুইপুরে ছোট্ট একতলা একটা বাড়ি তৈরি করে সেখানেই বাস করেন। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী ১৯৯৭ সালে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে এসেছিলেন বাংলাদেশ পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নিমন্ত্রণে। এর অনেক কাল পর ২০১৮ সালে পুজোর সময় 'বাংলাদেশ' নিয়ে তাঁর ভ্রমণচিত্রের ছবি তুলতে সেবারই তিনি প্রথম বরিশাল গিয়েছিলেন। গিয়েছিলেন বরিশালের বানরিপাড়ায় তার বাপ-ঠাকুরদার গ্রাম দেখতে। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় সম্মানসহ স্নাতক পাশ করেন ১৯৬৫ সালে। এরপরে তুলনামূলক সাহিত্য নিয়ে মাস্টার্স কোর্সে ভর্তি হয়েছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানকার শিক্ষকদের কবিতা পাঠ ও ব্যাখ্যা তাঁর ভালো লাগেনি। তিনি সরাসরি তা বলেছিলেনও। উদার হৃদয় মাস্টারমশাইয়েরা তাঁর কথায় রাগ করেননি, তাঁরা বুঝেছিলেন তাঁদের এ ছাত্রটি মেধাবী। তাঁরা উপদেশ দিয়েছিলেন তাকে মাস্টার্স সমাপ্ত করতে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করে 'কবিতা-পরিচয়' নামে কবিতা বিষয়ে আলোচনার পত্রিকাটি প্রকাশ করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। এ নিয়ে শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'সামান্য-অসামান্য' গ্রন্থে 'কবিতা-পরিচয়' ও 'ছেঁড়া ক্যাম্বিসের ব্যাগ' গ্রন্থে 'কোথায় পায় টাকা' শিরোনামে দুটি স্মৃতিজারিত লেখা লিখেছিলেন,। যাদবপুরে বাংলা সাহিত্য পড়িয়েছেন শঙ্খ ঘোষ, তবে তিনি তাঁর মাস্টারমশাই ছিলেন না, ছিলেন শ্রদ্ধেয় অগ্রজ। আবু সয়ীদ আইয়ুব, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, অম্লান দত্ত, শঙ্খ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রমুখ 'কবিতা-পরিচয়' পত্রিকায় লিখেছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের প্রধান, শঙ্খ ঘোষ ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর একদা শিক্ষক ও পরে সহকর্মী অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্যর ধারণা হয়েছিল, এটি সাম্যবাদ বিরোধী পত্রিকা, এর প্রকাশনায় অর্থ ঢালে আমেরিকার সিআইএ। নইলে ছেলেমানুষ ও ছাত্র অমরেন্দ্র টাকা পায় কোথা থেকে? এ বিষয়টি খোলসা করতেই শঙ্খ ঘোষ তাঁর শিক্ষককে যেমন বলেছিলেন, তাঁর নিবন্ধে তিনি লিখেছেনও তেমনই, 'এই ছেলেটি বাড়ির থেকে যে হাতখরচটুকু পায়, সেটুকু জমিয়ে জমিয়ে, আনেক সময় না খেয়ে, কখনও কখনও এর-ওর বাড়ি রাত কাটিয়ে কলকাতায় এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে, নিরভিযোগ নিরভিমানভাবে সামান্য এই কাগজখানি যে করে যাচ্ছে, সেটুকু আমি বলতে পারি। কেননা, সেসবের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে আমার, আমারও বাড়িতে সে থেকেছে কখনও কখনও। কাগজখানা করতে টাকাও যে খুব বেশি লাগছে তা নয়, আর আলোচনারও তো কোনও নির্দিষ্ট একটা ছাঁচ নেই, লেখা ছাপা হয় অনেকরকমেরই।' একবার পত্রিকার জন্য কাগজ কিনতে হবে। টাকা নেই। তিনি শঙ্খ ঘোষের কাছে পঞ্চাশ টাকা ধার চাইলেন, প্রতিশ্রুতি দিলেন পরবর্তী শনিবারে দিয়ে দিবেন। শঙ্খ ঘোষ তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি ৫০ টাকা দিতে পারবেন কিনা।

প্রতিমা ঘোষ এসে সামনের শনিবারের রেশন আনার দশ টাকার পাঁচটি নোট হাতে দিলেন। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী ছুটলেন কলেজ স্ট্রিটে কাগজ কিনতে।

'কবিতা-পরিচয়' পত্রিকার প্রকাশ প্রসঙ্গে তাঁর এক লেখায় জানতে পারি—
যাটের দশকের মাঝামাঝি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য পড়তে এসে কবিতা সম্পর্কিত গুরুগম্ভীর অ্যাকাডেমিক আলোচনা তাঁর ভালো লাগেনি। 'প্রিয় ইউরোপীয় কবিদের প্রায় দার্শনিক চেহারায় উপস্থিত হতে দেখে তাঁর অসহ্য লাগত, মানুষ যেভাবে ঘর ছেড়ে অরণ্যে যায় তিনি তেমনি লাইব্রেরিতে পালাতেন। তার মনে হত কবিতা কি কেবল প্রকৃতি, ধর্ম, ঈশ্বর, সভ্যতা বিষয়ে কবির দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের বাহন, কবিতা কি পাঠকের সঙ্গে কথা বলার, হৃদয়স্থাপনের বিষয় নয়? বাংলার আধুনিক কবিদের রচনার স্বর্ণ যে পুরনোকালের কষ্টিপাথর দিয়ে যাচাই করা যাবে না তাও বুঝতে পেরেছিলেন। তখুনি মাথায় আসে এই পত্রিকার আইডিয়া। সৌভাগ্য যে অগ্রজ কবিদের সমর্থন পেয়েছিলেন পুরোমাত্রায়। তাঁরা আলোচনা লিখে 'কবিতা-পরিচয়'কে এগিয়ে দিয়েছিলেন। একটি কবিতা ঘিরে যে এত গভীর আলোচনা, প্রত্যালোচনা হতে পারে তা 'কবিতা-পরিচয়'-এর মতো এমনি একটি সম্পূর্ণ নতুন ধারণার পত্রিকা না বেরুলে বোঝা যেত না। অর্থনৈতিক দৈন্য ছাড়া পত্রিকাটির আর কোনও দৈন্য ছিল না। ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল এই সময়কালে অনিয়মিতভাবে টেনেটুনে ১১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল আর্থিক অনটনে একেবারে বন্ধ হওয়ার আগে পর্যন্ত। পরে একটিইমাত্র সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। 'সম্পাদকের কথা'য় যেমন বলেছেন, ''কবিতা যে কেবল তার গদ্যার্থ নয়, নিছক ছন্দমিলের কারুকর্মও নয়, বরং ভাষায় রচিত শিল্পবিশেষ, এক অনিবার্য রূপসৃষ্টি'', তা ধরা পড়ল 'কবিতা-পরিচয়'-এর প্রতিটি সংখ্যায়। পত্রিকাটি আজ এক ঐতিহাসিক দলিলের মতো।

তুলনামূলক সাহিত্য ছাড়িয়ে ততদিনে তার আগ্রহ জন্মেছে সংবাদপত্র প্রকাশনার প্রযুক্তি ও সম্পাদনা বিষয়ে। তিনি এ উদ্দেশে আশির দশকের শেষভাগে ইউরোপের বেশ কিছু দেশে বিভিন্ন সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাসফরে যান এবং সেসব বিষয় শেখেন। তাঁর এই অভিজ্ঞতা কাজে লাগে তাঁর সম্পাদিত 'ভ্রমণ' ও অন্যান্য পত্রিকা প্রকাশে। নিজ দেশ ভারতে তিনি প্রচুর ভ্রমণ করেছেন। এছাড়া সংবাদপত্রের বিশ্ব অ্যাসোসিয়েশন ও বিশ্ব সম্পাদক ফোরামের নির্বাহী সদস্য হিসেবে ইউরোপ ও এশিয়ার অনেকগুলো দেশ ভ্রমণ করেন। এসকল ভ্রমণের সময়ে তিনি টেলিভিশনের জন্য কিছু অনবদ্য ও বিরল ভ্রমণ চলচ্চিত্র তৈরি করেন। এসব চলচ্চিত্রয় আন্টার্কটিকা, আলাস্কা, আফ্রিকা, চিন, মিশর, মোঙ্গোলিয়া, কম্বোডিয়া, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশের বিস্ময়কর সৌন্দর্য ধারণ করেছেন। দূরদর্শনে এসব চলচ্চিত্র বছরের পর বছর বিপুল সংখ্যক দর্শক দেখেছে, আর অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর নামটি ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। বস্তুত জনপ্রিয়তার নিরিখে ও কীর্তির বিচারে তাঁকে একজন জীবন্ত কিংবদন্তি বলা যায়। তিনি ওয়ার্লডস কংগ্রেস অব পোয়েটসের আমন্ত্রণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত একাধিক কবি সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। ২০০১ সালে অস্ট্রেলিয়া, ২০০২ সালে রোমানিয়া, ২০০৩ সালে তাইওয়ান, ২০০৬ সালে

মঙ্গোলিয়া, ২০০৮ সালে মেক্সিকো এবং ২০১২ সালে হাঙ্গেরি ভ্রমণ ছিল একটি সিরিজের মতো। এছাড়া ২০০৫ সালে জাপানে অনুষ্ঠিত এশিয়ান ও প্যান প্যাসিফিক অঞ্চলের কবিদের কনফারেন্সে যোগ দিয়েছেন। লেখালেখিতে অবদানের জন্য ২০০২ সালে আমেরিকার শিল্প ও সংস্কৃতির বিশ্ব অ্যাকাডেমি তাকে সম্মানসূচক ডক্টরেট অব লিটাররেচার ডিগ্রি প্রদান করে, যেটা তিনি কখনও কোথাও উল্লেখ করেন না। আমার ধারণা ছিল তিনি যে আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলোতে অনেকবছর যোগ দিয়েছেন সেগুলো বিশ্বপর্যটনের সঙ্গে যুক্ত। এখন দেখি তা সংবাদপত্র সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত। কথাসাহিত্যিক হিসেবেই তাঁর খ্যাতি অধিক, কবি হিসেবে নয়। তবু অবাক কাণ্ড যে তিনি কবি হিসেবে কবিতার একগাদা আন্তর্জাতিক উৎসবে যোগ দিয়েছেন। আমরা অবাক হলেও ওয়ার্ল্ড পোয়েট্রি ফোরামের কর্তারা মনে করেন কবি হিসেবে তিনি গুরুত্বপূর্ণ।

কবি শঙ্খ ঘোষ তাঁর অতি শ্রদ্ধেয় কাছের মানুষ। বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিকদের অনেকের সঙ্গে তাঁর ছিল সুগভীর হৃদ্যতা। তাঁদের লেখা চিঠিগুলি যা শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করা গেছে, 'কালের কষ্টিপাথর'-এ ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছে। 'বটের ঝুরি' নামে জানুয়ারিতে বই হয়ে বেরবার অপেক্ষা। এর মধ্যে আছে অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অমিয়ভূষণ মজুমদার, দেবেশ রায়, বুদ্ধদেব গুহের মতো বড়ো বড়ো কবি ও কথাসাহিত্যিকদের লেখা চিঠি। সবমিলিয়ে উনষাট জনের চিঠি বটের ঝুড়িতে সন্নিবেশিত।

তাঁর 'শাদা ঘোড়া' নিয়ে সিনেমা বানাবার কথা ভেবেছিলেন সত্যজিৎ রায়। বিভিন্ন জটিলতায় ছবিটি তৈরি না হলেও ওই মহান চলচ্চিত্রকারের সঙ্গে তাঁর একটি সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। তিনি প্রায়শই সত্যজিৎ রায়ের বিশপ লেফ্রয় রোডের বাড়িতে যেতেন, তাঁর ভাষায় অত্যুজ্জ্বল আলাপচারিতায় যোগ দিতে। সেসব আলাপচারিতা তিনি টুকে রাখেননি, কেবল একটি দিনের আলাপ, যেদিন সত্যজিৎ রায় 'পথের পাঁচালী' প্রসঙ্গে তাঁর শান্তিনিকেতনের শিক্ষক শিল্পী আচার্য নন্দলাল বসুর সঙ্গে তাঁর কথোপকথন বলেছিলেন, তিনি আনন্দবাজারে ছেপে দিয়েছিলেন। লেখাটিতে তাঁর কথোপকথন নিখুঁত ও সবিস্তারে তুলে ধরা সত্যজিৎ রায়কে মুগ্ধ করেছিল। তিনি সহাস্য জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনি কি গোয়েন্দা নাকি? পকেটে টেপ রেকর্ডার নিয়ে বেড়ান?'

'মুহূর্তের মহাসঙ্গ' ষাটের দশক থেকে নতুন সহস্রাব্দ অবধি বাংলা কবিতার চার মহারথী কবির সঙ্গে কাটানো অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর অমলিন স্মৃতির ভাণ্ডার। ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে এই লেখাগুলির, কেননা তা তুলে এনেছে বাংলা কবিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়, কবিদের সৃজনী চরিত্র ও গোপন স্বভাব। একবার কফি হাউজে দেখা হলে শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁকে কাঁথি থেকে দীঘা না গিয়ে জুনপুট যেতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। জীবনে সেই প্রথম সমুদ্রের সঙ্গে ভাব। আরেকবার দু'রাত অফিসে একটানা কাজ করে তৃতীয় রাতে তিনি ঘুমাতে গেছেন প্রবল ক্লান্তি আর ঘুম চোখে নিয়ে। শক্তি চট্টোপাধ্যায় এসে তাঁকে জাগালেন। ঘুমের ভেতর অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

শুনলেন, কে যেন তাকে বলছে, 'ওঠো অমরেন্দ্র। আমি বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় এসেছি।' ধড়ফর করে জেগে উঠে তিনি দেখেন শক্তি চট্টোপাধ্যায় দাঁড়িয়ে। মদ্যপানের নেশা শক্তিকে টেনে নিয়ে এসেছে রাতে। ভাগ্যিস আধবোতল হুইস্কি ছিল ঘরে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ই আনন্দবাজার পত্রিকায় সোমবারের 'আনন্দমেলা'র দায়িত্ব পেয়ে তাঁকে ধারাবাহিক কিছু লিখতে আহ্বান করেন। অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর প্রথম কিশোর রূপকথা 'শাদা ঘোড়া' এভাবেই সেখানে প্রকাশিত হতে থাকে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধেই তিনি গ্রামে ঘোরার অভিজ্ঞতা নিয়ে গ্রামগঞ্জের কড়চা লিখতে শুরু করেন, ওই আনন্দবাজারেই।

তাঁর লেখায় এক অসামান্য শঙ্খ ঘোষকে পাই, যিনি আমেরিকার আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিয়েটিভ রাইটিং প্রোগ্রামে গিয়েও কলকাতায় ফেরার জন্য হাঁসফাঁস করেছেন, ভেবেছেন সময়টা অপচয় হল, কবিতা লিখলে হতো শ্রেয়তর। অত বড় কবি, কিন্তু নিজের লেখা নিয়ে অতৃপ্তি ছিল। মনে করতেন পর্যাপ্ত লেখা হল না। বামফ্রন্ট আমলে তার নাট্য অ্যাকাডেমির চেয়ারম্যান পদ ত্যাগ করে আসার পরপরই বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফিরিয়ে আনতে। তিনি টলেননি। শঙ্খ ঘোষকে অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর মনে হয়েছে সারারাত পৃথিবী ভাসানো বৃষ্টির পরে সকালবেলার একটি গাছ, জোরে হাওয়া দিলে যে গাছ থেকে ঝরঝর করে জল পড়ে। অসাধারণ এই উপমা। একদিন অগ্রজ কবি উল্লাসের সঙ্গে আবিষ্কার করেন অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর পিতৃপুরুষের ভিটে আর তাঁর জন্মভিটে একই, বরিশালের বানরিপাড়া। এ এক আশ্চর্য সংযোগ। সহৃদয় ও প্রতিভাবান মানুষটির সঙ্গ অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর এক জীবনের সম্পদ।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর আরেক প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় মানুষ। তাঁর সঙ্গেও অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর অজস্র মনোমুগ্ধকর মুহূর্ত কেটেছে। হায়! তখন লিখে রাখেননি সেসব ঘটনা। সুনীলের তিরোধানের পরে স্মৃতি থেকে তুলে এনেছেন কিছু মুহূর্ত। যেদিন 'আমি কীরকম ভাবে বেঁচে আছি' বইটি বেরুল সেদিন কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১০-১৫ কপি নিয়ে কফিহাউসে ঢুকে সম্ভবত সাথীদের কাউকে না পেয়ে অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর টেবিলে এসে বসেছিলেন। অনুজকে তখন তিনি আপনি বলে সম্বোধন করতেন। জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আমার নতুন বই। আপনাকে দিলে আপনি নেবেন?' ভেতরের উত্তেজনা ও আনন্দ গোপন রেখে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী শান্তস্বরে বলেছিলেন, 'না দিলে আমাকে কিনতে হবে।' সুনীলের স্বাক্ষরিত সেই বই, কমলকুমার মজুমদার, বিনয় মজুমদার স্বাক্ষরিত অনেক বইয়ের সঙ্গে হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। হারানো অনেক স্মৃতির সঙ্গে তারাও লোপাট হয়ে গেছে, কখনও পরিচিতজনের হাতসাফাই, পড়তে নিয়ে ফেরত না দেওয়া, কখনও বাসাবদলের বলি, আবার কখনও উনুন ধরাতে তৎপর পাচিকার আগুনের সলতে হয়ে ওঠা অমূল্য সব গ্রন্থ। আরেকটি স্মৃতিতে উঠে এসেছে পার্ক স্ট্রিট নিকটবর্তী এক গোরস্থানে কবি বেলাল চৌধুরীর খুপরিঘরে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একরাত্রি কাটানোর ঘটনা। শ্রীচক্রবর্তীর সেলিমপুরের অ্যাপার্টমেন্টে বেলাল চৌধুরীর লাজুক উপস্থিতিতেই গল্পটা শুনিয়েছিলেন স্বয়ং সুনীলই। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে কোনও এক বৃহস্পতিবারের

সন্ধ্যায় অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়িতে এসে ছোটো মাছ ভাজার সঙ্গে ধোঁয়ার গন্ধমাখা মল্ট হুইস্কি লাগাবুলিন পানাহারের কথা ছিল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের। সেই সন্ধ্যা আর আসেনি। আসতে পারেননি শরীরটা তাঁর ভাষায় 'বেজুত লাগার জন্য'। নির্ধারিত সেই বৃহস্পতিবার চলে গেলে তৃতীয় বৃহস্পতিবারে তিনি এক সাহিত্য সম্মেলনে আমন্ত্রণ পেয়ে আফ্রিকার ঘানায় চলে গেলেন। কথা ছিল ফিরে এসে দেখা হবেই। সেই সন্ধ্যাটি আর আসেনি, অধরাই রয়ে গেল।

চল্লিশের দশকের অন্যতম প্রধান কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর পরিচয় সেই ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকে শুরু; ন্যাশনাল লাইব্রেরির সিঁড়িতে তাঁদের বহুবার দেখা হয়েছে। একজন নেমে আসছেন, একজন উঠছেন। একবার লখনউয়ে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন সভাপতি আর অমরেন্দ্র চক্রবর্তী শিশুসাহিত্য শাখার সভাপতি। অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ভাষায় 'মহীরুহের পাশে বটচারাসম'। সেখানে অমলিন হয়ে আছে অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর হোটেল-কক্ষে সিনিয়র কবির মধ্যরাত ছাড়িয়ে আড্ডার স্মৃতি; অভিনেতা পাহাড়ি সান্যালের ভ্রাতুষ্পুত্র রাসু সান্যাল যতবার সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে নিতে গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন ততবারই তিনি বলেছিলেন, দু'ঘণ্টা পরে আসতে। এই করে করে রাত্রি দেড়টা পার। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। এ প্রসঙ্গে কিশোর বয়সে কলকাতায় নিখিল ভারত লেখক সম্মেলনে ঘরোয়া সাক্ষাতে বুদ্ধদেব বসুকে তিনি বলতে শুনেছেন, 'একই সঙ্গে সক্রিয় কমিউনিস্ট ও সার্থক কবি হয় কি না ভেবে দেখো।' কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য হলে কী হবে, জ্ঞানপীঠ ও আকাদেমি পুরস্কার পেলেও তিনি পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের রবীন্দ্র পুরস্কার পাননি। এটা আশ্চর্যের! কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় যে মানুষ হিসেবে কত নিরহঙ্কারী ও বড়ো মাপের ছিলেন তা বোঝাতে একটি উদাহরণ যথেষ্ট। একবার 'কর্মক্ষেত্র' সাপ্তাহিক পত্রিকায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নিয়মিত ফিচার 'কাজের বাংলা'য় লেখক পরিচিতিতে ভুল করে সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে তাঁর অন্যান্য পুরস্কারের সঙ্গে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী লিখেছিলেন, তিনি রবীন্দ্র পুরস্কারে ভূষিত। ভুলটি তৎক্ষণাৎ সংশোধন করতে অমরেন্দ্র চক্রবর্তীকে চিঠি দিয়েছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। পরিচিতিতে তাকে প্রবাদপ্রতিম বলে উল্লেখ করাটাও সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে সঙ্কোচে ফেলে দিয়েছিল। অনুরোধ করেছিলেন তা মুছে দিতে। তিনি বেশ স্নেহ করতেন অমরেন্দ্র চক্রবর্তীকে, অকপটে নিজের অনেক গভীর ব্যক্তিগত কথাও বলতেন অনুজকে। প্রায়ই সন্ধ্যায় আসতেন তাঁদের বাড়িতে। সেইরকমই এক রবিবার সন্ধ্যায় অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর বাসায় তাঁর আসার কথা ছিল। সেদিন দুর্ভাগ্যবশত বাড়ির লিফট অকেজো হয়ে গিয়েছিল, অমরেন্দ্র চক্রবর্তী গাড়ির চালককে পাঠিয়েছিলেন দুজন দ্বাররক্ষককে নিয়ে একটি চেয়ারে কবিকে বসিয়ে উপরে নিয়ে আসতে, কারণ তখন তাঁর অনেক বয়েস, সিঁড়ি ভাঙার মতো জোর নেই হাঁটুতে। পরে আশ্চর্য হয়ে শুনলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় সেই চেয়ারে বসেননি, হেঁটে সিঁড়ি বেয়ে উঠেছেন। বলেছিলেন, 'অন্যের কাঁধে একবারই চড়ব। তাও জীবন থাকতে নয়।' আজীবন অর্থকষ্টে ভুগেছেন, কিন্তু আপস করেননি।

মুহূর্তের মহাসঙ্গ লেখা হতে পারত বাংলা সাহিত্যে আরও অনেক মহারথী প্রসঙ্গেই। এদের একজন ত্রিশের প্রবাদপ্রতিম কবি ও সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু। তরুণ বয়সে কবিতা পরিচয় পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ তাকে নিয়ে গিয়েছিল এ সকল কবির সান্নিধ্যে। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী বুদ্ধদেব বসুকে অনুরোধ করেছিলেন জীবনানন্দ দাশের একটি কবিতা নিয়ে আলোচনা করতে। তিনি বেছে নিয়েছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্তের নৌকাডুবি কবিতাটি। সেটিই সেই মুহূর্ত তার কাছে বেশি জরুরি মনে হয়েছিল। লেখাটি যেদিন তিনি হাতে দিলেন অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর মনে হল উষ্ণ আশ্চর্য পাণ্ডুলিপির পাতা। লেখাটি হাতে তুলে দিয়ে বুদ্ধদেব বসু সস্নেহে বলেছিলেন, 'তোমার জন্য আমার আটটা দিন নষ্ট হল। এখন তো আমার শারদীয় সংখ্যার লেখার চাপ।' তিনি বুদ্ধদেব গৃহে যেতেন কেননা বুদ্ধদেব বসুর কথা বলার নিজস্ব শৈলী ও বিষয়ের বিস্তার তাঁকে চুম্বকের মতো টেনে রাখত।

'নিমফুলের মধু' তাঁর প্রথম ছোটগল্প সংকলন। দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'দ্রৌপদীর থান' বেরুবে, প্রায় ৩২ বছর পরে। ২০১৩ সালে ধারাবাহিকভাবে লেখেন প্রথম উপন্যাস 'বিষাদগাথা'। প্রকাশকালেই উপন্যাসটি পাঠকপ্রিয়তা পায়। এর চারবছর পরে প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় উপন্যাস 'জিপসি রাত'। কমিউনিজম ভেঙে পড়বার ক্রান্তিকালের পটভূমিতে লেখা মানবিক সম্পর্কর উপন্যাস 'জিপসি রাত'। দুটি উপন্যাসেরই রিভিউ লিখেছিলেন শক্তিমান কথাসাহিত্যিক দেবেশ রায়। এ এক বড়ো প্রাপ্তি। কেননা দেবেশ রায় হলেন সেই শক্তিমান ঔপন্যাসিক যিনি উপন্যাসের তত্ত্ব ও বয়ান নিয়ে চারটি গ্রন্থ লিখেছেন, উন্মোচিত করেছেন উপন্যাসের সমালোচনার নতুন দিগন্ত। অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর 'জিপসি রাত'কে তাঁর মনে হয়েছে উপন্যাসের ধরাবাঁধা ছকের বাইরে এক অভিনব রচনা, সাধারণ পাঠক যাকে খাপছাড়া ভাবতে পারে। কিন্তু দেবেশ রায় তাঁর জহুরি চোখ দিয়ে ঠিকই এ উপন্যাসের ঘূর্ণাবর্তের ভেতর কেন্দ্রাতিক শক্তি অবলোকন করেন। উপন্যাসের ভেতর লোকজনের অনবরত আসা-যাওয়া, নানা যানবাহনে তাদের গতায়াত, সম্পর্কের ভাঙা-গড়া 'জিপসি রাত'কে করেছে বহু আয়তনিক।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর প্রথম উপন্যাস 'বিষাদগাথা'তেও উপন্যাসের প্রচলিত ছক ভাঙার প্রয়াস, প্রচুর মানুষের আনাগোনা দেখা যায়। দেবেশ রায় তাঁর আলোচনা শুরুই করেছেন এই বলে যে, বিষাদগাথা উপন্যাসটি গল্প-উপন্যাস নিয়ে আমাদের অভ্যাসের ও অভ্যাস থেকে তৈরি ধারণার, একেবারে বাইরে। দেবেশ রায় লিখেছেন, উপন্যাসটি পড়ে কোনও পাঠকের পক্ষে বলা সম্ভবই নয়--- উপন্যাসের গল্পটি কী, প্রধান গল্পটি কী, সেই গল্পের প্রধান চরিত্রের পরিচয় কী? এত যে মানুষের সমাবেশ, অনেকটা টলস্টয়ের মাস্টারপিস ওয়ার অ্যান্ড পিস এর মতো, তারা কেউ কিন্তু নামহারা নন, অনেকটা পরিব্রাজকের চোখে দেখা ক্ষণিকের মানুষগুলো, সমুখে আসে এবং বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে যায়। এই মানুষের স্রোতকে ধরে রাখে কিছু স্থানবিন্দু উপন্যাসে, দেবেশ রায়ের ভাষায়, 'সবথেকে সঙ্গতিপূর্ণ ও স্থায়ী অবস্থান (রেফারেন্স পয়েন্ট)।' দেবেশ রায়ের মতে, এই স্থানবিন্দুদের ছাড়া এত ঘটনা, এত মানুষ ও এত পরিণতিহীন গতির কোনও কেন্দ্র খুঁজে বার করা কঠিন হত, প্রায়

অসম্ভব হত। এরপরে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন এই যে আমরা একটি কেন্দ্র খুঁজি, একটা পরিণতি চাই সেটা আমাদের পুরনো অভ্যাস। লেখক যেখানে কেন্দ্রটিকে নিখোঁজ রাখতে চান, অনেক দাগ মুছে ফেলেন, এমনকি সেইসব দাগ যা তিনি দেননি। মার্কেসের যেমন 'মাকুন্ডা গ্রাম', অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর এ উপন্যাসে তেমনি 'বালিসোনা গ্রাম', যে গ্রাম বদলে যাচ্ছে, সেখানে বিদেশি পুঁজি পর্যন্ত এসে ঢুকেছে, যে গ্রামের স্বরূপ সন্ধানে মৃতরা এসে যোগ দেন জীবিতদের সঙ্গে (পরাবাস্তবতা)। উপন্যাসটির কোনও মীমাংসা টানেননি অমরেন্দ্র চক্রবর্তী, তিনি দেখাননি কোনও পরিণতি। বিষাদগাথা উপন্যাসটির আলোচনার শিরোনামটিই এক বড়ো স্বীকৃতি। দেবেশ রায় শিরোনাম দিয়েছিলেন 'বিরল মৌলিকতার সাহস ও সামর্থ্য'।

প্রথম কাব্য 'বিক্ষত অন্বেষণ' প্রকাশিত হয়েছিল বেশ আগে, সেই ১৯৬২ সালের মার্চে। 'বিক্ষত অন্বেষণ'-এর দুটি অংশও ওই একই সময় দুটি বিখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। একটি দেশ-এ। আরেকটি পরিচয়-এ। ষাটের দশকের মাঝামাঝি তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সুদর্শন যুবক আড্ডা দিচ্ছেন কফিহাউজে তখনকার ও ভবিষ্যতের বিখ্যাত সব কবি লেখকদের সঙ্গে। এরা হলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বেলাল চৌধুরী, বিনয় মজুমদার, শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। মাঝেমাঝে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ও আসতেন। কফিহাউসের জানলার দিকে একপাশে নির্মাল্য আচার্য 'এক্ষণ' পত্রিকার প্রুফ দেখতেন। ধীরে, সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে আসতেন কবি তুষার রায়। অমরেন্দ্র চক্রবর্তীকে প্রায়ই বলতেন তার 'নিরন্তর' কবিতা নিয়ে তিনি একটি সিনেমা বানাবেন। বানাতে পারছেন না কারণ মৃত্যুর রং কী হবে তা ধরতে পারছেন না। একবার নাকি বলেছিলেন, মৃত্যুর রং হবে মহিষের তলপেটের মতো। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী তাঁকে কিছু খাওয়াতে চাইলে মানা করতেন। শুধু কফি আর পকোড়া খেতেন। গলদা চিঙড়ি, সর্ষে ইলিশ, মুড়িঘণ্ট দিয়ে ভাত খেয়ে এসেছেন বলে মিথ্যে গল্প বলতেন। আসলে প্রায়শই অভুক্ত থাকতেন। একদিন চলে যাওয়ার সময় বললেন, 'একটা সিকি হবে?' হয়তো ওটা ছিল তার বাড়ি ফিরে যাওয়ার বাসভাড়া। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় তখন সত্যজিৎ রায়ের 'অভিযান'-এ অভিনয় করছেন। কখনও আড্ডায় আসতে দেরি হলে বলতেন, 'তেলের দাম বেড়ে গেছে। আগের মতো অত কি আসা যায়?' তাঁর ছিল একটি পুরনো অস্টিন গাড়ি। নিজেই চালাতেন। সেসময়ে মৃণাল সেন 'কলকাতা ৭১' চলচ্চিত্রটি বানানোর চিন্তা করছেন। একবার কফিহাউসে অমরেন্দ্র চক্রবর্তীকে বলেছিলেন তিনি রিয়েলিটি ভেঙে দেবেন। যেমন, শ্যামবাজার থেকে বালিগঞ্জ যেতে দক্ষিণেশ্বর পড়ে না, কিন্তু তিনি তার ছবির চরিত্রকে ওইপথে যেতে দক্ষিণেশ্বর ঘুরিয়ে আনার উল্লেখ করবেন।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী বলেন, 'নিরন্তর নিয়ে একটা মহার্ঘ স্মৃতি আছে আমার। একদিন প্রায় মধ্যরাতে কলকাতার গ্র্যান্ড হোটেলে গণেশ পাইনকে পেয়ে নিরন্তর কবিতাটির অর্ধেক পড়ে শোনালাম। শিল্পী মন দিয়েই শুনে একটু চুপ করে আছেন দেখে ফট করে বলে বসলাম, কবিতাটা আপনি ইলাস্ট্রেট করবেন?'

শুনেই প্রশ্ন, 'রঙে ছাপাবেন?'

'আপনি আঁকলে নিশ্চয়ই।'

উনি বললেন, 'কাল দুটো কপি পাঠিয়ে দিলে চেষ্টা করতে পারি।'

দুঃখের বিষয়, কী এক রহস্যময় কারণে শেষপর্যন্ত গণেশ পাইনের মতো শিল্পীর রংতুলির স্পর্শ থেকে 'নিরন্তর' বঞ্চিতই রইল।

পরদিন ওঁর ঠিকানায় গলির মধ্যে পুরনো দোতলা বা তেতলা বাড়ির দরজায় অনেক কড়া নেড়েও নাকি শিল্পীর দেখা পাওয়া যায়নি। যার হাতে কবিতাটা পাঠিয়েছিলাম, তাঁর কাছে শুনলাম, বারবার কড়া নাড়ায় উপরের জানলা থেকে মুখ ঝুঁকিয়ে এক বৃদ্ধা নাকি ভারি বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন।

দীর্ঘ ১১ বছর বিরতির পরে প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় কাব্য নিরন্তর। বিক্ষত অন্বেষণ ও নিরন্তর দুটো কাব্যকে এক মলাটের ভিতর এনে প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালে। দুটিই দীর্ঘ কবিতা। এই নামের ভেতরেই যেন তাঁর দিনলিপি ধরা– অন্বেষণ, সেও বিক্ষত। আর নিরন্তর তাঁর খুঁজে চলা। স্যাঁ জন পার্সের আনাবাজ পাঠ করে তার ভেতরে এক ঘোরের সৃষ্টি হয়েছিল, তারই প্রভাবে তিনি লিখে ফেলেন এক নতুন কাব্যভাষার নিরীক্ষাধর্মী গ্রন্থ 'নিরন্তর'। এই দীর্ঘ কবিতাটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনে শক্তি চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, এত বড় লেখা, একটাও অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করতে হয়নি।

চার বছর পরে ১৯৭৫ সালে বেরয় তৃতীয় কাব্য 'অন্ধকার শব্দকোষ'; তার পরে 'লেখা না লেখা'। মনে হয় অনেকবছরে তাঁর ভেতরে লেখা না লেখার দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও অনেক কবিতা জমেছিল, ভরে উঠেছিল অন্ধকারের শব্দকোষ। এরপরে আবার দীর্ঘ বিরতি। ২০০৬ সালে প্রকাশিত হয় 'নদী জানে, কচি নিমপাতারাও জানে' এক মনোরম নামের কবিতাগ্রন্থ। ২০১১ সালে 'মৃত্যুর অধিক এই মেরে ফেলা' সমসাময়িক সময়কে দুর্দান্ত লিপিবদ্ধ করেছে। তাঁর সর্বশেষ কাব্যের নাম 'ভূমিকম্পের রাত'।

তাঁর 'হীরু ডাকাত' পাঠ করে লীলা মজুমদার লিখেছিলেন, 'এই লেখকের শাদা ঘোড়া পড়ে ভেবেছিলাম কি ভালো কি ভালো। এ যে আরও ভালো; মনকে নাড়া দেয়। রূপকথার রূপ ধরে বাংলার ইতিহাস কথা কয়।' তাঁর আলোচনার শিরোনাম ছিল রূপকথার রূপ ধরে ইতিহাস। এই ইতিহাস হল বিংশ শতকের একেবারে গোড়ায় বাংলায় স্বদেশি সশস্ত্র বিদ্রোহীদের এক ছায়াপাত। হীরু ডাকাতের মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় রবিনহুডের চরিত্র যে জমিদারদের সম্পদ লুঠ করে গরীবদের মাঝে বিলিয়ে দিত। ছোটোদের জন্য লেখা তাঁর তিনটি কবিতার বই 'আমার বনবাস', 'টিয়াগ্রামের ফিঙেনদী' ও 'তালগাছের ডোঙা' প্রসঙ্গে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেছেন, শিশুসাহিত্যে যখন কেবল ছড়ার ছড়াছড়ি, তখন শিশুদের হাতে কবিতা তুলে দিচ্ছেন কবি অমরেন্দ্র চক্রবর্তী। ছোটোদের জন্য লেখা তার দুটি গল্পের বই 'হরিণের সঙ্গে খেলা' ও 'গৌর যাযাবর' এবং পাখিদের রোজকার কথোপকথন নিয়ে লেখা বই 'পাখির খাতা' নিয়ে লিখতে গিয়ে পবিত্র সরকার বলেছেন, 'অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অদৃশ্য হাত রেখেছেন এই লেখকের মাথায়', প্রতিবেশিনী লীলা মজুমদার অসুস্থতা থেকে উঠে এসে তাঁর পিঠে হাত রেখেছেন, 'নইলে চমৎকার ভাষায় নিজেকে এমন মেলে ধরলেন কী করে অমরেন্দ্র?'

'আমাজনের জঙ্গলে' গ্রন্থের আলোচনায় মহাশ্বেতা দেবী 'চাঁদের নিজের দেশে'

প্রবন্ধে অমরেন্দ্র চক্রবর্তীকে বলেছেন 'জাদু-গল্পকার'। লিখেছেন, 'এমন নিষ্পাপ রোমান্টিকতা, শৈশবের এমন জাদুছবি, সেইসঙ্গে অরণ্য ও অরণ্যবাসী মানুষজনের এমন পরিচয়, এ যেন মনে পড়ায় বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়কে।' এরপরে মহাশ্বেতা দেবী যে প্রশ্নটি তোলেন তা আমার কাছে মনে হয়েছে অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর লেখক জীবনের একটি বড়ো পুরস্কার। তিনি প্রশ্ন করেন, 'অমরেন্দ্র কি বিভূতিভূষণের মাপের লেখক?' আমরা সকলেই জানি উত্তরটি হবে, না। মহাশ্বেতা দেবী নিজেই তাঁর উত্তর দিয়েছেন, 'তিনি এই সময় ও যুগের এক অন্যরকম চারণিক'। শিশুদের জন্য নানা বয়সের সব গল্প বলার জন্য এই প্রশ্ন আমাদের নিঃসংশয় করে যে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী বড়ো মাপের শিশুসাহিত্যিক। মহাশ্বেতা দেবী আক্ষেপ করেছেন যে, বাড়িতে দিদিমা-ঠাকুমাদের গল্প বলার আর শিশুদের সে গল্প নিবিষ্ট হয়ে শোনার ব্যাপারটিই আজ চলে গেছে। অথচ শিশুমনে, মহাশ্বেতা দেবী যাকে বলেছেন কুমারী মৃত্তিকা, কল্পনার ভুবন তৈরির জন্য গল্প বলা ও শোনা কতই না প্রয়োজন। এই মূল্যবান কাজটিই করছেন শিশুসাহিত্যিকগণ, অমরেন্দ্র চক্রবর্তী যাঁদের মধ্যে প্রথম সারির। আমি অবাক হয়ে লক্ষ করি অগ্রজ ঔপন্যাসিক চান, অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ও বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য আধুনিক অপঠিত ধ্রুপদী শিশুসাহিত্যকে ক্যাসেট করে শিশু ও বয়স্কদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হোক। কেননা বড়োরাও গল্প শুনতে পছন্দ করে। অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর শিশুসাহিত্য পাঠ করে মহাশ্বেতা দেবী এতটাই উচ্ছ্বসিত যে তিনি দাবী জানিয়েছেন তাঁর বইগুলো ভারতের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হোক। তাঁর সে ইচ্ছেও পূরণ হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর কয়েকটি ছোটদের বই ভারতের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে যাদের শীর্ষে 'শাদা ঘোড়া'।

তাঁর একটি কবিতা 'কাল স্বপ্নের মধ্যে' ১৯৭৫ সালে দেশ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য নির্বাচিত হয়ে সেসময় ভারতে জরুরি অবস্থার কারণে প্রকাশ করা হয়নি, কেননা কবিতাটি ছিল প্রতিবাদের জ্বলন্ত অঙ্গার। প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী ভূপেন হাজারিকার খুব প্রিয় ছিল কবিতাটি; তিনি বলেছিলেন, সুর বসিয়ে তিনি গদ্য-কবিতাটিকে গানে রূপান্তরিত করবেন। সেটা অবশ্য পরে আর হয়নি।

তাঁকে বাঙালি জানে বিশ্ব ভ্রামণিক ও 'ভ্রমণ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমানে প্রধান সম্পাদক হিসেবে। একথাও সত্য যে তিনি ভ্রমণের উপর ১০টি সংকলন গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন, কিন্তু তার ভ্রমণ বিষয়ক পুস্তক মাত্র দুটি। 'বন্ধুভরা বসুন্ধরা' মূলত অচেনা দেশে অচেনা মানুষের কাহিনি যে মানুষরা তার বন্ধু হয়েছিল। দ্বিতীয় বই 'পাহাড়ি গরিলার খোঁজে'তে ঘটেছে অনেকগুলো ভ্রমণকাহিনির সমাবেশ। সুমেরুবৃত্তে ভ্রমণ নামে একটি ক্ষীণকটির পুস্তিকা ছিল তার, সেটিও এই গ্রন্থে জুড়ে দিয়েছিলেন। পৃথিবীর যত দেশ ঘুরেছেন তত ভ্রমণকাহিনি লেখেননি। গ্রহটির যেসব অঞ্চলে তিনি গিয়েছেন সেসব অঞ্চল নিয়ে মনোমুগ্ধকর সব ভিডিও বানিয়েছেন দূরদর্শনের জন্য। তার সেই বিখ্যাত হ্যান্ডিক্যাম ক্যামেরা দিয়ে আন্টার্কটিকার পেঙ্গুইন থেকে আলাস্কার বরফের উপর দিয়ে স্লেজটানা কুকুর, মিয়ানমারের সিনানদো প্যাগোডা থেকে চিনের নিষিদ্ধ নগরী ছবি ও কথায় তুলে এনেছেন। আন্টার্কটিকা ভ্রমণের তিন মাস পরে যান আফ্রিকা ভ্রমণে, তারও পাঁচ মাস পরে যান আলাস্কা

দর্শনে। আর এসবই ঘটেছে তার অগ্রসর বয়সে। চলচ্চিত্রগুলোতে ছবিকে কথা দিয়ে ভারী করে তুলতে চাননি, দর্শককে ছবি দেখার সিনেমাটিক সুযোগ দিয়েছেন, কেবল পাঠক যেখানে পথহারানো পথিক সেখানে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন। সেসব ভিডিওতে খুব সামান্যই নিজেকে চিত্রায়িত করেছেন, অস্থির দৃশ্যের সঙ্গে শান্ত ধারাভাষ্য যোগ করেছেন কোনও সুস্থির ঘরে বসে। তার প্রতিটি কাজে নিষ্ঠা চোখে পড়ে, কোনও তাড়াহুড়ো নয়, নয় কোনও বাড়াবাড়ি, গ্রহটি যে আমাদের দেখার বাইরে অনুপম সুন্দর--- তা যেমন মনে করিয়ে দেওয়া, তেমনি দর্শককে চলচ্ছবিময় ভ্রমণের সঙ্গী করে নেওয়া। এর চেয়ে বেশি কোনও প্রয়াস নয়।

'ভ্রমণ' পত্রিকার পূজা সংখ্যার সঙ্গে তাঁর বিশ্বভ্রমণের একেকটি ভ্রমণ চলচ্চিত্র, কোনওটিরই দৈর্ঘ্য এক ঘণ্টার কম নয়, পাঠকদের বিনিপয়সায় উপহার দেওয়ার একটি রীতি চালু করেছেন। মহাচীন নিয়ে তৈরি চলচ্চিত্রটি এত দীর্ঘ যে সেটি দিতে হয়েছে দুটি পূজা সংখ্যায়। দু'ঘণ্টার ছবিটি খণ্ড খণ্ড করে ইউটিউবে, তাও পুরোটা নয়, মোট ১৬টি ছোটো ভিডিওক্লিপ তৈরি হয়েছে। আমি কয়েকটি দেখেছি। দেখে মুগ্ধ হয়েছি। মায়ানমার ও ইন্দোনেশিয়া ভ্রমণ নিয়ে তৈরি করেছেন আরও দুটি ভ্রমণচিত্র। বাংলাদেশ নিয়ে নির্মিত ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের ছবির পুরোটা দেখিনি, ভিডিওক্লিপ দেখেছি। তিনি বলেছেন,'এত দেশ ঘুরে এলাম, ঘরের পাশে বাংলাদেশ দেখা হল না।' বাংলাদেশে স্বল্প সময়ের জন্য এসে নদীদের বিস্তার দেখে তিনি আবেগে আপ্লুত হয়েছেন। ধারাভাষ্যে বলেছেন, নদীর সন্তান এই দেশ, এর সবদিকেই নদী, এই নদী ওর মা, ওই নদী ওর মাসি। বাংলাদেশে এসে তিনি বিস্মৃত হন না যে একই মাতৃভাষার এই দেশ তাঁর আত্মার আত্মীয়। বলেন, এত কম দেখে বাসনা মেটে না। ফিরে যেতে শিরায় টান লাগে।

আজীবন ভ্রমণপ্রিয় মানুষটি মানুষ কেন ঘুরে বেড়ায়--- তা নিয়ে ভেবেছেন। ভারতের সাহিত্য আকাদেমি প্রকাশিত 'জসিম উদ্দিন' গ্রন্থে জসিম উদ্দিনের ভ্রমণ নামে তাঁর একটি নিবন্ধে পাই এর উত্তর। তিনি বলেছেন, প্রকৃতিপ্রেম, পুণ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা, ইতিহাসের প্রতি ভালোবাসা কিংবা ভূগোলের প্রতি আকর্ষণ--- প্রভৃতি হল ভ্রমণের প্রাথমিক প্রেরণা। প্রকৃতির নানা অনুষঙ্গ--- পাহাড়, নদী, সমতল, সমুদ্র, অরণ্য হল মানবমনের সৌন্দর্যছবির ফ্রেমমাত্র; ফ্রেমের ছবিটি হল মানুষ। দেখবার আসল ছবি হল মানুষ আর মানুষের প্রতি মায়া-মমতা। জসিম উদ্দিনের ভ্রমণকথায় তিনি এটাই প্রত্যক্ষ করেছেন। অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর নিজের বিশ্বাসও তাই। পৃথিবীর নানা প্রান্তে ঘুরে বেড়ানো ভ্রামণিক ও ভ্রমণলেখক শংকর রঞ্জন রায় চৌধুরীকে দেওয়া এক সম্বর্ধনায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এই কথাটিই বলেন। প্রায় অর্থশূন্য হয়েও কী করে শংকর রঞ্জন রায় চৌধুরীর পক্ষে সম্ভব হল তার পৃথিবীদর্শন? এর উত্তর হল, ওই মানুষের মনের দয়া-মায়া, অবিনশ্বর মানব প্রকৃতি। দেশে দেশে বিরোধ হতে পারে, মানুষে মানুষে কোনও বিরোধ নেই। এ বক্তৃতায় তার সেই অসামান্য কথাটির পুনরুক্তি পাই, যা তিনি বলেছিলেন জসিম উদ্দিনের উপর লেখা নিবন্ধে, যত মন তত ভ্রমণ।

আগামী মার্চে তাঁর আশি বছর পূর্ণ হবে। একটি সংগঠন তাঁকে নিয়ে প্রামাণ্যগ্রন্থ

প্রকাশের তোড়জোড় করেছে, তিনি হেসে বলেছেন, 'আমার আবার কখন আশি হল, আমি তো নিজেকে পঁয়ষট্টির উপরে ভাবিই না।' অগ্রসর বয়সে তিনি একদিকে যেমন একের পর এক ছবি এঁকে চলেছেন, তেমনি লিখে চলেছেন কথাসাহিত্য। বিশ্বপ্রকৃতির রূপে মুগ্ধ এই বালকটির মনের বয়স সত্যি বাড়েনি। তার চেহারায় একটি কান্তি আছে যা বয়স লুকাতে সক্ষম। একবার ব্রাজিলের সাও পাওলোতে অভ্যাগত অতিথিদের দুটি ভাগে ভাগ করে লাঞ্চের সময়ে প্রথমে সিনিয়র সিটিজেনদের সার্ভ করার ঘোষণা এলে তিনি যখন লাইনে দাঁড়ালেন তখন অনেক বুড়োর মনে প্রশ্ন উদিত হয়েছিল, এই তরুণ সিনিয়রদের লাইনে কেন? এমনকি তাকে পরের ব্যাচে খাবার নিতে পরামর্শ দিয়েছিল পরিবেশকরা। তাঁর সম্প্রতি আঁকা ছবি আমাকে যারপরনাই মুগ্ধ করেছে। সামার কালার বা গ্রীষ্মের রং ছবিটি প্রধানত সবুজ, লাল আর হলুদের এক বৃক্ষময় পাহাড়ের বুক, যে বুকের গভীরে একটি নীলরঙা হাতি তার ছানাটিকে নিয়ে দণ্ডায়মান। উজ্জ্বল রঙের এই রিয়ালিস্টিক এক্সপ্রেসনিজমের ছবিটি মায়াবী দৃশ্য তুলে ধরে। কবিতা দিয়ে শুরু করা এই বহুমাত্রিক প্রতিভার ভেতরে সবর্দাই কাব্যিক চোখ ও মনন কাজ করে। তাঁর আঁকা ছবিতে এক কবিচিত্রীর দেখা পাই।

আমরা নির্ধারিত সময়ের চেয়ে অনেক বেশি সময় নিয়ে ফেলেছিলাম। কখন যে এতটা সময় চলে গিয়েছিল তিনিও টের পাননি। ছাদের সব গাছ কয়েকবার দেখা হয়ে গেলে আর ফুলদের নামের তালিকা মেমোরিতে ভারী হয়ে এলে আমরা ফিরে আসার উদ্যোগ নিই। আমাদের সঙ্গে তার ক্রমশ উষ্ণ হয়ে ওঠা আলাপচারিতার ছেদ টানতে হয়, কেননা তিনি ঘড়ি ধরে চলেন আর আমাদেরও বিবিধ কাজ পড়ে আছে বিপুল নগরী কলকাতাতে। আমরা তাঁকে ও তাঁর সহধর্মিণী, যিনি তাঁর অনেক বিদেশ ভ্রমণেরও সঙ্গিণী, বিদায় জানিয়ে সেই প্রাচীন লিফট বেয়ে নীচে নেমে আসি। বিদায়বেলায় তিনি মাহমুদ হাফিজকে 'কালের কষ্টিপাথর' পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা এনে দিলেন, কিন্তু মাহমুদ হাফিজকে দেওয়ার জন্য রাখা দুটি বই দিতে ভুলে গেলেন। গল্পের তোড়ে মাহমুদ হাফিজও বিষয় ভুলে থাকেন। আমরা এতক্ষণ একটি ঘোরের ভেতরেই ছিলাম। সাক্ষাৎকারকেন্দ্রিক জীবন ও কৃতির মিশেলে রচিত এ লেখাটি শেষ করতে চাই তাঁর একটি কবিতা ও একটি ক্ষণের বচন উদ্ধৃত করে। কবিতাটি তার জীবনদর্শনের কথা বলে, এমনকি বলে তার সৃষ্টির সারল্যের কথা। ক্ষণের বচনটি তুলে ধরে আমাদের অবক্ষয়িত কালকে, যখন রাজ আনুগত্য লাভের জন্য কবি-লেখক-শিল্পীদের সারিটি হতাশা জাগিয়ে কেবলি দীর্ঘ হচ্ছে।

নিরাবরণ কথা

তুমি যে প্রেমের কথা বলো
তুমি যে তারার কথা বলো
তুমি যে জীবনকথা কথা বলো
তুমি যে ঈশ্বররূপ বলো
লেবুপাতার মতো আমি সবই
হাতের তালুতে ডলে দেখে নিতে চাই।

ক্ষণের বচন

কবি-শিল্পী যদি হয় ক্ষমতার অন্ধ কাছাকাছি
প্রজার জীবন নিয়ে রাজা খেলে ঘোর কানামাছি।

সৌজন্য: *ঢাকা থেকে প্রকাশিত কবি, সাংবাদিক ও ভ্রামণিক মাহমুদ হাফিজ সম্পাদিত ভ্রমণসাহিত্যের পত্রিকা 'ভ্রমণগদ্য'।* ***প্রকাশ:*** *জানুয়ারি ২০২১।*

লেখক পরিচিতি
কবি, অধ্যাপক ও ভ্রামণিক